আল্ কোরআন-এর অলৌকিক সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য

اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِى الْقُرْاٰنِ

‘সকল কল্যাণ নিহিত আছে আল্ কোরআনে।’
–(ইল্হাম)।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী
হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদি[illegible]নী (আঃ)-এর
অমৃত-বাণীর ভাণ্ডার থে[illegible] উদ্ধৃত

ভাষান্তর ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় ঃ প্রকাশনা বিভাগ,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
সফর - ১৪১৮
জ্যৈষ্ঠ - ১৪০৪
জুন - ১৯৯৭

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
১১/৪, টয়েনবি সার্কুলার রোড,
ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকের কথা

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আ:) : আপ্‌নি তাহ্‌রীরু কি রূ ছে'- - শীর্ষক সংকলন গ্রন্থের একাংশের বঙ্গানুবাদ এই পুস্তক। তের শতাধিক পৃষ্ঠার এই সংকলনে আল্লাহ, রসূল (সা:), ইসলাম, কোরআন শরীফ, নাজাত, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে উদ্ধৃতি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিপুল রচনাসম্ভার থেকে বাছাই ও সংকলনের এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছেন মোহ্‌তারম সৈয়্যদ দাউদ আহমদ সাহেব-রা: (রবওয়া)। আল্লাপাক তাঁকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অতি উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন।

এই পুস্তকের মূল উর্দূ রচনায় আলোচিত কোরআন শরীফের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যামূলখ অর্থ পেশ করা আছে। এই বঙ্গানুবাদে পাঠকের সুবিধার্থে সেই আয়াতগুলির হুবহু তর্জমাও দেওয়া হলো, এবং সেই সঙ্গে আয়াত-নম্বরও। তবে, এখানে নম্বর গণনায় ১ (এক) করে বেশী ধরতে হবে। কেননা, এক্ষেত্রে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম'-সহ আয়াতের সংখ্যা গণনার যে নিয়ম তা-ই অনুসৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য অনুবাদের অনুক্রমে ৮নং উদ্ধৃতি বাদ পড়েছে। এবং ক্রমিক সংখ্যা (৯)-এর স্থলে (৮) ছাপা হয়েছে। দুঃখিত।

ভূমিকা

পবিত্র গ্রন্থ 'আল্ কোরআন'-এর সার্বিক ও সর্বোত্তম হেফাজতের অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ্তায়ালা এই বলে ঃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

[নিশ্চয় আমরাই অবতীর্ণ করেছি এই যিকর্ (আল্ কোরআন) এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী'-১৫ঃ১০]।

হেফাযতের এইরূপ অঙ্গীকার আল্লাহ পাক অন্য আর কোনও কেতাবের জন্যই করেননি। পবিত্র কোরআনের সংরক্ষণের সুষ্ঠু ও সামগ্রিক ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রয়েছে প্রধানতঃ দু'ভাবে ঃ

(এক) হাফেজগণের দ্বারা ;

(দুই) ওলী আল্লাহগণ এবং বিশেষ করে, প্রতি শতাব্দীতে আগমনকারী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগণের দ্বারা।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম তিন উত্তম শতাব্দীর পর বক্রতার যুগ শুরু হয়। এবং এই ধারায় মুসলিম উম্মাহ-এর অধঃপতন চরমে পৌঁছে হিজরী তের শতকের শেষপাদে। এই যামানার বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

('এবং এই রসুল বলিবে, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার জাতি এই কোরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুতে পরিণত করে নিয়েছে।' ২৫ঃ৩১)

এই যামানার বর্ণনা প্রসঙ্গে মেশকাত শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ

'মানুষের উপরে এমন এক যামানা আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছু বাকী থাকবে না এবং কোরআনের রসুম ছাড়া (অক্ষর ছাড়া) কিছু বাকী থাকবে না।'

বলা বাহুল্য, এটাই ছিল সেই যামানা সে যামানায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি ছিল। আল্লাহ্ পাকের লাখো শুকরিয়া যে, তাঁর (আঃ) আগমন ঘটে গেছে যথাসময়ে ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক। তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে যমীন, সাক্ষ্য দিয়েছে আসমান। অগণিত ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে

তাঁর সমর্থনে। তাঁরই পুতনাম **হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)**। তিনি এসেছেন। তাঁর দায়িত্বাবলী পালন করেছেন। ইসলাম ও আল-কোরআনের অলৌকিক সৌন্দর্য ও মহাত্ম্যকে পুনরায় সুনির্মলরূপে প্রকাশিত করেছেন দুনিয়াবাসীর সামনে চূড়ান্ত পর্যায়ে। হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শকে আবারও একবার শ্রেষ্ঠতম, উৎকৃষ্টতম ও সুন্দরতম প্রমানিত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জগতের বুকে। পবিত্র কলেমা–'**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**'–এর ঐশীদীপ্ত পতাকা আজ উড্ডীন হয়ে চলেছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তাঁরই পবিত্র হস্তে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত-এর কল্যাণে। খাঁটি ইসলামের জেহাদ-এ-কবীর আজ ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার দেশে দেশে। পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন ভাষায়। জাতিসমূহের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার পাক কালাম। বাকী, হেদায়াতের মালিক তো আল্লাহ্‌।

সুধী পাঠক ! আমরা এই পুস্তকটিতে হযরত মির্যা সাহেবের (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলী থেকে সংগৃহীত কোরআন শরীফের অনুপম শান ও সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বজনীন কল্যাণ সম্পর্কিত কিছু অমৃতবাণীর বঙ্গানুবাদ আপনাদের সামনে পেশ করছি। অনুবাদ করেছেন জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, সেক্রেটারী ইশায়াত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। প্রুফ দেখেছেন জনাব মৌলবী মুতিউর রহমান সাহেব এবং অনুবাদক। ভুল-ত্রুটি গোচরীভূত হলে আগামীতে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌ ।

পুস্তকটির প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহপাক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আল্লাহ আমাদের সকলের হাদী, হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন।

খাকসার

১০/৬/৯৭ ইং

(মীর মোহাম্মদ আলী)
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

ঢাকা
১০/৬/৯৭ইং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِى الْقُرْاٰنِ

'সকল কল্যাণ নিহিত আছে আল্ কোরআনে' –*(ইলহাম)*।

'আমরা এই কথার সাক্ষী এবং আমরা সারা দুনিয়ার সামনে এই সাক্ষ্য দান করছি যে, আমরা সেই সত্যতা সেই সাদাকাত যা খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, তা পেয়েছি কোরআন থেকেই। আমরা সেই খোদার আওয়াজ শুনেছি এবং তাঁর শক্তিশালী মহাবাহুর নিদর্শন দেখেছি যিনি কোরআন প্রেরণ করেছেন। অতএব, আমরা দৃঢ় ঈমান এনেছি যে, তিনিই সত্য খোদা এবং তিনিই সমস্ত জগতের অধিপতি। আমাদের হৃদয় সেই দৃঢ় ঈমান দ্বারা এমনভাবে ভরপুর, যেমন পানি দ্বারা সমুদ্র ভরপুর। সুতরাং, আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতেই সবাইকে এই ধর্ম এবং এই আলোকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা সেই সত্য আলো বা সেই নূরে হাকীকি লাভ করেছি যা অন্ধকারের পর্দা অপসারণ করে, এবং যা আল্লাহ্ ছাড়া বাকী সবকিছুর প্রতি হৃদয়কে শীতল করে দেয়। এটাই একমাত্র পথ, যে পথে চলে মানুষ প্রবৃত্তির তাড়না এবং অহম-এর অন্ধকার থেকে ঠিক সেভাবেই বেরিয়ে আসে, যেভাবে বেরিয়ে আসে সর্প তার খোলস থেকে।'

–*(কিতাবুল বারিয়া, পৃ. ৬৫)*

(২)

'এটা তো জানা কথাই যে, প্রত্যেকটি বস্তুর সবচাইতে বড় গুণ বা উৎকর্ষতা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে তাকে তৈরী করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য যেন তা পূর্ণ করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একটা বলদ খরিদ করা হয় জমি চাষের জন্যে, তাহলে সেই বলদটির গুণাগুণ যাচাই করা হবে তার জমি চাষ করার যোগ্যতার ভিত্তিতে। তেমনিভাবে এটাও জানা কথাই যে, আসমানী কিতাব বা ঐশী গ্রন্থের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে তার আনুগত্যকারীকে আপন শিক্ষা, প্রভাব এবং সংশোধনী শক্তি দ্বারা এবং আপন আধ্যাত্মিক গুণাবলী দ্বারা প্রত্যেক পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে এক পবিত্র জীবন দান করবে। পবিত্র করবার পর খোদাকে সনাক্ত করার জন্য তাকে উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টি দান করবে। এবং সেই অনুপম সত্তা যা সমস্ত আনন্দের প্রস্রবণ, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে দিবে। কেননা, প্রকৃত প্রস্তাবে, এইরূপ মহব্বতই হচ্ছে নাজাত বা পরিত্রাণের মূল। এবং এটাই সেই বেহেশ্ত্ যেখানে প্রবেশ করলে সমস্ত শ্রান্তি, সমস্ত তিক্ততা, সমস্ত দুঃখ-বেদনা এবং আযাব ও অশান্তি দূরীভূত হয়ে যায়। অতএব নিঃসন্দেহে, পরিপূর্ণ বা কামেল ঐশীগ্রন্থ্ হচ্ছে সেই গ্রন্থ্ যা খোদান্বেষীকে উক্ত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়। এবং তাকে ইতর জীবন থেকে পরিত্রাণ দিয়ে সেই সত্যপ্রিয়তমের সাথে তার মিলন ঘটিয়ে দেয়, যার মিলনই হচ্ছে স্বয়ং নাজাত বা

পরিত্রাণ। এবং সকল প্রকারের সন্দেহ ও সংশয় থেকে নিষ্কৃতি দান করে তাকে এমন পূর্ণ উপলব্ধি বা কামেল মারেফত দান করে, যেন সে তার খোদাকে দর্শন করছে। এবং খোদার সঙ্গে তার এরূপ দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় যে, সে খোদাতা'লার এক বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হয়। খোদা তার প্রতি এত বেশী দয়া ও অনুগ্রহ করেন যে, তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়ে তার এবং অন্যান্যদের মধ্যে এক পরিষ্কার পার্থক্য সৃষ্টি করে দেন, এবং তার কাছে আপনার সূক্ষ্ম উপলব্ধির বা মারেফতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। যদি কোন কেতাব এই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, যা তার আসল কর্তব্য, এবং অহেতুক আজেবাজে দাবী পেশ করে নিজের সত্যতা প্রমাণ করতে চায়, তাহলে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে দাবী করে যে, সে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক, কিন্তু যখন কোন রোগীকে তার সামনে হাজির করা হয় এবং বলা হয় যে, এর চিকিৎসা করে একে সুস্থ করে তোল তখন সে বলে, আমি তো তাকে সুস্থ করতে পারবো না, তবে আমি কুস্তি করতে পারবো খুব দক্ষতার সাথেই এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রেও আমার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। স্বভাবতঃই এই ব্যক্তিকে ভাঁড় বলে আখ্যায়িত করা হবে, এবং প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই তার নিন্দা করবে। খোদার কেতাবের এবং খোদার রসূলের পৃথিবীতে আগমনের মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীকে পাপ ও পঙ্কিলতার জীবন থেকে মুক্ত করা এবং খোদার সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেওয়া। তাঁদের উদ্দেশ্য তো এটা নয় যে, তাঁরা মানুষকে পার্থিব জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলবেন কিংবা তাদেরকে পার্থিব আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে প্রশিক্ষণ দিবেন।

বস্তুতঃ কোন বিচক্ষণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা উপলব্ধি করা আদৌ কোন কঠিন ব্যাপার নয় যে, খোদার কেতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে খোদার পথে পরিচালিত করা এবং খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় ঈমান ও নিশ্চিত জ্ঞান দান করা। এবং মানুষের মনে খোদাতায়ালার মহিমা-মাহাত্ম্য ও ভীতির সঞ্চার করে তাকে পাপাচার ও পাপ-প্রবণতা থেকে বিরত রাখা, ফিরিয়ে আনা। অন্যথায়, আমরা সেই কেতাব দিয়ে কি করবো, যে কেতাব না হৃদয়ের মালিন্য দূর করতে পারে, না এরূপ কোন পবিত্র ও পূর্ণ মারেফত বা গূঢ় তত্ত্বোপলব্ধি দান করতে পারে যা পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে যে, পাপের প্রতি যে আকর্ষণ তা কুষ্ঠব্যাধির ন্যায়, মারাত্মক কুষ্ঠব্যাধির ন্যায়; এবং এইরূপ কুষ্ঠব্যাধি কিছুতেই দূর করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না খোদাতায়ালার জীবন্ত মারেফতের প্রকাশ বা তজল্লী এবং তাঁর ভয় ও মাহাত্ম্য ও কুদরতের নিদর্শন বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হয়; এবং যতক্ষণ না মানুষ খোদাতায়ালার পরাক্রমশালী শক্তিকে অতিশয় নিকটবর্তী মনে করে, ঠিক যেমন মনে করে কোন ছাগল তার থেকে দু'কদম দূরবর্তী কোন সিংহকে। মানুষের পক্ষে প্রয়োজন কুপ্রবৃত্তির মারাত্মক তাড়না থেকে মুক্ত হওয়া, এবং তার হৃদয়ে খোদার মহিমা ও মাহাত্ম্য বা আযমত এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে করে সেই অভিভূতকারী কুপ্রবৃত্তির কামনা ও তাড়না যা বিজলীর মত তার উপরে পতিত হয় এবং তার খোদাভীতি বা তাকওয়ার সঞ্চয়কে জ্বালিয়ে দেয়, তা দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু, সেই যে প্রবৃত্তির অপবিত্র তাড়নাসমূহ যা কিনা মৃগীর ন্যায় বার বার আক্রমণ করে এবং পরহেযগারীর বা সংযমশীলতার তাবৎ বুদ্ধি-বিবেচনাকে নষ্ট করে ফেলে, তা কি কেবল এক স্বকপোলকল্পিত অর্থাৎ লৌকিক

পরমেশ্বরের ধারণা দ্বারা দূরীভূত হবে? কিংবা, নিজস্ব চিন্তা-চেতনার দ্বারাই অপসৃত হবে? কিংবা তার প্রতিকার কি এমন কোন ব্যক্তির কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা করা যাবে, যার দুঃখ তার নিজের আত্মা থেকেই তিরোহিত হয়নি? না, কোনক্রমেই না। এটা কোন সাধারণ কথা নয়। বরং এটাই বুদ্ধিমান মানুষের কাছে সবচে' গভীরভাবে চিন্তা করবার বিষয় যে, সেই যে ধ্বংস, যা দুঃসাহসিকতা এবং খোদার সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণে দেখা দেয়, যার মূল হচ্ছে পাপ ও অবাধ্যতা, তা থেকে কী করে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। এটাও তো জানা কথাই যে, মানুষ সন্দেহযুক্ত কোন কিছুর খাতিরে তার নিশ্চিত সুখ ও আনন্দকে পরিত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু একটা নিশ্চয়তা আর একটা নিশ্চয়তা থেকে মুক্ত করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যদি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, অমুক একটা বনের মধ্যে একপাল হরিণ আছে, এবং আমরা যদি শিকারের জন্য উদ্যোগও গ্রহণ করি এবং পরক্ষণেই আমরা যদি নিশ্চিতরূপে এ-ও জানতে পারি যে, ঐ বনের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক সিংহ আছে এবং হাজার খানেক আজদাহাঁ হাঁ করে শিকার ধরার অপেক্ষায় আছে, তাহলে তো তৎক্ষণাৎ আমরা হরিণ শিকারের ইচ্ছা পরিত্যাগ করবো। ঠিক এইভাবে, নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া পাপও দূরীভূত হতে পারে না। লোহাকে লোহা দ্বারাই ভাঙ্গা যায়। খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য এবং ভয়-ভীতি সম্পর্কে এরূপ নিশ্চিত জ্ঞান জন্মানো দরকার যাতে অনীহা ও উদাসীনতা বা গাফলতির তামাম পর্দা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, এবং শরীরে এরূপ ভীতিপ্রদ শিহরণ সৃষ্টি হয় যাতে মনে হবে যেন মৃত্যু সামনেই উপস্থিত। এবং হৃদয়ের উপরে ভীতি এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করবে যে, অবাধ্য আত্মা বা নফ্সে আম্মারার যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং মানুষ অদৃশ্য হস্তের আকর্ষণে খোদার প্রতি ধাবিত হবে এবং তার হৃদয় এই নিশ্চিত জ্ঞানে ভরপুর হবে যে, খোদা সত্যি সত্যিই অস্তিত্ববান এবং তিনি কোন পাপীকেই বিনা শাস্তিতে ছাড়বেন না। পক্ষান্তরে, সত্যিকারের পবিত্রতা-পিয়াসী ব্যক্তি এমন কেতাব দিয়ে কি করবে যে কেতাব তার সেই প্রয়োজন মিটাতে পারবে না?

অতএব, আমি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, **সেই কেতাব যা ঐ সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পুরোপুরি সক্ষম, তা হচ্ছে কোরআন শরীফ**। এই কেতাবের মাধ্যমে মানুষ খোদার প্রতি আকৃষ্ট হয়, ধাবিত হয়, এবং দুনিয়ার প্রতি তার মোহ-মমতা শীতল হয়ে যায়। এবং সেই খোদা যিনি গোপনের চাইতেও গোপন, তিনি অবশেষে আপন সত্তাকে প্রকাশিত করেন। সেই সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর শক্তিসমূহের কথা, কুদরতের কথা যা অপরাপর জাতিগুলি জানে না, তা সবই কোরআনের আনুগত্যকারী মানুষকে স্বয়ং প্রদর্শন করেন এবং তাকে ফেরেশতাদের জগৎ পরিভ্রমণ করান, এবং তার কাছে **'আনাল মওজুদ'** অর্থাৎ আমি উপস্থিত রয়েছি বলে আপন অস্তিত্বের ঘোষণা দেন। কিন্তু 'বেদ'-এর তো এই বৈশিষ্ট্য নেই। কোনভাবেই নেই। বেদগুলি তো সেই পোকায় খাওয়া বাণ্ডিলের মত, যার মালিক হয় মরে গেছে, নয়তো তার কোন পাত্তাই নেই। কে জানে এই বাণ্ডিলগুলো আসলে কার! যে পরমেশ্বরের প্রতি বেদ আহ্বান জানায়, তার জীবিত থাকাও প্রমাণিত হয় না। বরং বেদ একথার কোন প্রমাণই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না যে, তার পরমেশ্বর সত্যি সত্যিই অস্তিত্ববান। বেদ-এর গোমরাহ্ বা বিভ্রান্তকারী শিক্ষা এ ব্যাপারেও সন্দেহ ও বাধা সৃষ্টি করে যে, সৃষ্টি

থেকেও স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়। কেননা, বেদের শিক্ষামতে আত্মা ও পরমাণু সব আদি থেকেই বিদ্যমান এবং এগুলো সৃষ্ট নয়। অতএব, যা সৃষ্ট নয় তারই মাধ্যমে কী করে তাঁর স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যাবে? এছাড়া, বেদ ঐশীবাণী বা কালামে ইলাহীর দরজাও বন্ধ করে দিয়েছে। এবং তা খোদাতায়ালার তাজা নিদর্শনেরও অস্বীকারকারী। বেদ-এর মতে পরমেশ্বর তাঁর খাস বান্দাদের সাহায্যের জন্য এমন কোন নিদর্শন দেখাতে পারে না, যা সাধারণ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে। সুতরাং, বেদ-এর সম্পর্কে যদি খুব বেশী বেশী সুধারণা পোষণ করা যায় তাহলে এতটুকু বলা যাবে যে, বেদ সাধারণ-বুদ্ধির মানুষের মতোই শুধু খোদার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে, কিন্তু খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পেশ করতে পারে না। বস্তুতঃ বেদ এমন কোন সূক্ষ্ম উপলব্ধি বা মারেফতের জ্ঞান দান করতে পারে না, যা সদ্যলব্ধ জ্ঞানরূপে খোদাতায়ালার কাছ থেকে আসে এবং যা মানুষকে মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত করে আকাশে উন্নীত করে। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা এবং তাঁদেরও যাঁরা আমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছেন, আমাদের এই কথার সাক্ষ্য দান করে যে, কোরআন শরীফ তার স্বীয় আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং আলোকের দ্বারা তার আনুগত্যকারীকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে, এবং তার হৃদয়কে আলোকিত করে দেয়; এবং তাকে বড় বড় নিদর্শন দেখিয়ে খোদার সঙ্গে তার এমন সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়, যা অতি ধারালো তরবারি দ্বারাও কেটে আলাদা করা যায় না। কোরআন হৃদয়ের চক্ষু খুলে দেয়। পাপের পঙ্কিল প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। খোদাতায়ালার সুমিষ্ট বাণী লাভের সম্মানে ভূষিত করে। গোপন জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মোচিত করে। প্রার্থনা গৃহীত হতে বা দোয়ার কবুলিয়ত লাভে সহায়তা করে এবং সে সম্পর্কে খবরাদি অবহিত করে। কোরআন শরীফের প্রকৃত আনুগত্যকারী ব্যক্তির বিরোধিতা যারা করে তাদের প্রত্যেককেই খোদাতায়ালা ভয়াবহ নিদর্শন প্রদর্শন করে প্রমাণিত করে দেন যে, তিনি তাঁর সেই বান্দার সঙ্গে আছেন, যে বান্দা তাঁর কালাম-এর অনুবর্তিতা করে।' *–(চশ্‌মা মারেফাত, পৃ. ২৯১–২৯৫)।*

(৩)

'সেই যে খোদা, যাঁর সাথে মিলনে মানুষ নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দলাভ করে, তাঁকে কোরআন শরীফের আনুগত্য ছাড়া কোনমতেই পাওয়া যায় না। হায়! আমি যা দেখেছি তা যদি লোকেরা দেখতে পেতো, এবং আমি যা শুনেছি তা যদি তারা শুনতে পেতো, এবং কেচ্ছা-কাহিনীকে ছেড়ে দিয়ে প্রকৃত সত্যের প্রতি ধাবিত হতো! সেই পূর্ণজ্ঞান বা কামেল ইল্‌ম যার মাধ্যমে খোদা দৃষ্টিগোচর হন; সেই যে ময়লা ধৌতকারী পানি যার দ্বারা সকল সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়; সেই যে আয়না যার মধ্য দিয়ে সেই মহান অস্তিত্বের দর্শন লাভ করা যায়; তা হচ্ছে খোদাতায়ালার সাথে সেই বাক্যালাপ ও সম্বোধন যার উল্লেখ আমি একটু আগেই করে এসেছি। যার আত্মার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা রয়েছে সে উঠুক এবং অনুসন্ধান করুক। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যদি আত্মাগুলির মধ্যে সত্যানুসন্ধানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যদি হৃদয়গুলি পিপাসার্ত হয়, তাহলে লোকেরা যেন সেই পদ্ধতিরই অনুসন্ধান করে, এবং সেই পথেরই সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু, সেই যে পথ, তা কোন্ পদ্ধতিতে উন্মুক্ত হবে, এবং তার পর্দা কোন্ প্রার্থনার দ্বারা অপসারিত হবে? আমি সকল অনুসন্ধানকারীকে নিশ্চয়তা দান

করছি যে, একমাত্র **ইসলামই সেই ধর্ম** যা সেই পথের সুসংবাদ দান করে। অন্যান্য জাতিগুলো তো বহুকাল যাবৎ খোদাতায়ালার ইল্‌হাম বা ঐশীবাণীর উপরে মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং, নিশ্চিতরূপে জেনে রাখো যে, এই মোহর খোদাতায়ালার পথ থেকে লাগানো হয়নি, বরং হতাশার কারণে মানুষ এ এক বাহানা সৃষ্টি করে নিয়েছে। নিশ্চয়ই জানবে যে, এটা যেমন সম্ভব নয় যে, আমরা চক্ষু ছাড়াই দেখি, কান ছাড়াই শুনি, জিহ্বা ছাড়াই কথা বলি, ঠিক তেমনি এটাও সম্ভব নয় যে, কোরআন ছাড়াই সেই প্রিয় বন্ধুর চেহারা দেখি। আমি যুবক ছিলাম এখন বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমি এমন কাউকেই পাইনি, যে ঐ পবিত্র ঝর্ণা ছাড়াই স্বচ্ছ মারেফতের পেয়ালা পান করেছে।' *(ইসলামী উসুল কি ফিলসফী, পৃ. ১২৮, ১২৯)*

(৪)

'সবচাইতে সোজা রাস্তা এবং উত্তম উপায় যা নিশ্চয়তার আলোকরাশি দ্বারা উদ্ভাসিত এবং আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও জ্ঞানবুদ্ধির উন্নতির জন্য যোগ্যতম পথপ্রদর্শক, তা হচ্ছে কোরআন করীম। এই কেতাব পৃথিবীর যাবতীয় বিতর্ক ও মতানৈক্যের মীমাংসার দায়িত্বভার নিয়ে এসেছে। এর আয়াতে আয়াতে শব্দে শব্দে হাজারো ধরনের (জ্ঞানের) ধারা-প্রবাহ মিশে আছে, এবং যার মধ্যে প্রচুর জীবনদায়িনী পানি বা 'আবে হায়াত' ভরপুর হয়ে আছে। এবং যার অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণে বিরল ও অমূল্য মণি-মুক্তো লুক্কায়িত রয়েছে, যা প্রতিদিনই প্রদর্শিত হয়ে চলেছে। এ এক উত্তম কষ্টিপাথর যার সাহায্যে আমরা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। এই সেই উজ্জ্বল প্রদীপ যা আমাদেরকে সত্যের পথ প্রদর্শন করে। সন্দেহ নেই, যে সমস্ত লোকের সত্য পথের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, এবং সেই পথের সঙ্গে এক প্রকারের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের হৃদয়কে কোরআন শরীফের প্রতি আকর্ষণ করা হয়। তাদের হৃদয়কে খোদায়ে করীম স্বয়ং এমনভাবে বানিয়েছেন যে, তারা প্রেমিকের ন্যায় আপন প্রিয়তমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং যারা তাকে ছাড়া স্বস্তি লাভ করে না। এবং তার কাছ থেকে সাফ ও সরল কথা শোনার পর অন্য আর কারো কথা শুনবার প্রয়োজন বোধ করে না। তার প্রত্যেকটি সত্যতাকে খুশীমনে আগ্রহ সহকারে কবুল করে নেয়। পরিশেষে, এটাই হয়ে যায় তার হৃদয়কে এবং চিন্তা-চেতনাকে আলোকিত করে তোলার উপায়, এবং বহুবিধ বিস্ময়কর বিষয় প্রদর্শিত হওয়ার পন্থা। এবং এটাই প্রত্যেককে তার যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নতির শিখরে উপনীত করে।

ধর্মভীরু বা সাধু ব্যক্তিদের প্রয়োজন সর্বদাই কোরআন করীমের আলোকের মধ্যে পথ চলা। যদি কখনও কোন যামানায় নতুন কোন অবস্থার উদ্ভবে ইসলামের সঙ্গে অন্য কোন ধর্মের বা মতবাদের বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তার সঙ্গে মোকাবিলা করার যে শাণিত ও কার্যকর অস্ত্র প্রস্তুত রয়েছে, তা হচ্ছে কোরআন করীম। তেমনিভাবে, কোন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনাকে যদি এর বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয়, তাহলে সেই বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলার শক্তিও হচ্ছে এই কোরআন করীম। যেমন সে ইতোপূর্বে তা করেছে এবং সেইসব বিরোধী দর্শনকে হেয় এবং লাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করে সেগুলির চেহারা আয়নায় দেখিয়ে দিয়েছে। দেখিয়ে দিয়েছে যে, সত্য দর্শন এটা না ঐটা।

বর্তমান যুগেও যখন খৃষ্টান মিশনারীরা মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়ালো এবং নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদেরকে তৌহীদ থেকে টেনে বের করে একজন দুর্বল মানুষের উপাসনাকারী বানাতে চাইলো, এবং তাদের সব সন্দেহপূর্ণ ধ্যান-ধারণাকে নানা প্রকারের কুতর্কের আবরণে আচ্ছাদিত করে রাখলো এবং সারা ভারতে এক তুফান সৃষ্টি করলো, তখন একমাত্র কোরআন করীমই তাদেরকে পিছু হট্‌তে বাধ্য করেছিল। এখন, তারা কোন জানাশোনা মানুষের কাছে মুখও দেখাতে পারে না। এবং তাদের সব ওজর-অজুহাতকে তারা এখন কাগজের মত দুমড়ে-মুচড়ে রেখে দিয়েছে।' *(ইজালা আওহাম, পৃ. ২৮১, ২৮২)।*

(৫)

'আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় এ (পবিত্র কোরআন) একটি অনন্য মুক্তো। এর বাইরে আলো, এর ভিতরে আলো, এর উপরে আলো, এর নীচে আলো, এবং এর প্রতিটি শব্দে আলো। এ এক আধ্যাত্মিক বাগান, এর থোকা থোকা ফল নাগালের মধ্যেই। এর মধ্য দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। সৌভাগ্যের প্রতিটি ফল এর মধ্যে পাওয়া যায়। এর দ্বারাই প্রতিটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। এর আলো আমার এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এই আলো আমি আর অন্য কোনও উপায়েই সংগ্রহ করতে পারতাম না। আল্লাহ্‌র কসম! যদি কোরআন না থাকতো, তাহলে আমি জীবনে কোন আনন্দই পেতাম না। এর সৌন্দর্য লাখো ইউসুফের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে গেছে। আমি এর প্রতি প্রবল আগ্রহে ধাবিত হই এবং এথেকে প্রাণভরে পান করি। এ আমাকে লালন করেছে, তেমনিভাবে, যেভাবে ভ্রূণ লালিত হয় গর্ভাশয়ে। এর বিস্ময়কর প্রভাবে প্রভাবিত আমার হৃদয়। এর সৌন্দর্য আমাকে দূরে নিয়ে যায় আমার আত্মা থেকে। আমার কাছে কাশ্‌ফী হালতে অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টির অবস্থায় প্রকাশিত করা হয়েছে যে, পবিত্রতার বাগান সিঞ্চিত করা হয় কোরআনের পানি দ্বারা, যা জীবনদায়িনী পানির এক উত্তাল মহাসমুদ্র। এথেকে যে পান করে সে বেঁচে যায়, এবং অন্যদেরকেও বাঁচায়।'

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম পৃ. ৫৪৫। আরবীর ইংরেজী থেকে বাংলা; দ্র : (Sir) Muhammad Zafrulla Khan : The Essence of Islam, Vol 2, P. 233)

(৬)

'খাতামান্নবীঈন' কথাটি, যা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের জন্য বলা হয়েছে, তার চাহিদা হচ্ছে, এবং তার মধ্যেই একথা নিহিত আছে যে, যে কেতাব আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপরে নাযিল করা হয়েছে তাকেও হতে হবে 'খাতামাল কুতুব'। এবং এর মধ্যে সমস্ত পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা বা কামালত নিহিত থাকতে হবে। বস্তুতঃ সমস্ত প্রকারের কামালতই বিদ্যমান রয়েছে এর মধ্যে। কেননা, ঐশী বাণী বা কালামে ইলাহী অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম ও নীতি এটাই যে, যে ব্যক্তির উপরে তা অবতীর্ণ হবে, সেই ব্যক্তির পবিত্রকরণ শক্তি ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতা যে পরিমাণে হবে, সেই পরিমাণে শক্তি ও সাহায্যও থাকবে তার উপরে অবতীর্ণ ঐশী কালামের মধ্যেও। **আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের পবিত্রকরণ শক্তি ও অভ্যন্তরীণ ঔৎকর্ষ যেহেতু উন্নত থেকে উন্নত স্তরের ছিল, যার চাইতে অধিক উন্নত**

স্তরে কোন মানুষ না অতীতে উপনীত হয়েছেন, না ভবিষ্যতে হবেন, সেহেতু, কোরআন শরীফও অতীতের সমস্ত কেতাব ও সহিফা (পুস্তিকা) থেকে সেই উন্নত মোকামে ও স্তরে উন্নীত যেখানে অপর আর কোনও কালামই উন্নীত হয়নি (এবং ভবিষ্যতেও হবে না)। যেহেতু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের ধারণ ক্ষমতা এবং 'কুয়্যতে কুদ্সীয়া বা পবিত্রকরণ শক্তি সকলের চাইতে বেশী ছিল এবং সকল প্রকারের পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা তাঁরই মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, অর্থাৎ খতম হয়ে গিয়েছিল, এবং শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল ; এবং যেহেতু তাঁর (সাঃ) সেই মোকামেই তাঁর উপরে অবতীর্ণ হয়েছিল কোরআন শরীফ, সেহেতু কোরআন শরীফও সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ণতা ও উৎকর্ষতায় বা কামালতে উপনীত হয়েছিল। এবং যেভাবে নবুওয়তের কামালত তাঁর উপরেই সম্পূর্ণ হয়েছে, খতম হয়েছে, সেভাবেই কালাম বা বাণীর অলৌকিকত্বের উৎকর্ষতাও,–এজাযে কালাম-এর কামালতও–কোরআন শরীফের উপরেই সম্পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ খতম হয়ে গেছে। তাই তিনি (সাঃ) হয়েছেন খাতামুন্নবীঈন এবং তাঁর কেতাব হয়েছে খাতামুল কুতুব। বাণীর অলৌকিকত্বের চূড়ান্ত স্তর যতটা হওয়া সম্ভব তার সাকল্যটাই সবদিক থেকেই তাঁর কেতাবের মধ্যে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। তা সে রচনাশৈলীর উৎকর্ষতার দিক থেকেই হোক, বিষয়-বস্তুর ক্রমবিন্যাসের দিক থেকেই হোক, শিক্ষার দিক থেকেই হোক, আর শিক্ষার পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে থেকেই হোক, কিংবা শিক্ষার ফলপ্রসূতার দিক থেকেই হোক। বস্তুতঃ যে দিক থেকেই দেখো না কেন, দেখতে পাবে যে, কোরআন শরীফ হচ্ছে পূর্ণতম ও সর্বোত্তম। এবং এথেকেই প্রমাণিত হয় তার অলৌকিকত্ব। এবং এ কারণেই, কোরআন শরীফ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অতুলনীয় হওয়ার কথা বলেনি, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতুলনীয় হওয়ার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছে। পারলে যে কেউ যে কোনদিক থেকে এর মোকাবেলা করুক, তা সে রচনার অনবদ্য প্রাঞ্জলতা ও স্টাইলের দিকে থেকেই করুক, বিষয়-বস্তু ও উদ্দেশ্যের দিক থেকেই করুক, ভবিষ্যদ্বাণী ও অদৃশ্যের খবরাদি যা কোরআন শরীফে আছে সে সম্পর্কেই করুক। এক কথায়, যেদিক থেকেই দেখো না কেন, দেখতে পাবে, এ অলৌকিক, এ মোজেযা।'

(মলফুযাত, খ. ৩ পৃ. ৩৬–৩৭)

(৭)

'কোরআন শরীফ এমন এক মোজেযা যার দৃষ্টান্ত না পূর্বে কখনও ছিল, না পরে কখনও হবে। যার কৃপা-করুণা ও আশিস-কল্যাণের–ফুয়ূয ও বারাকাতের দুয়ার সর্বদাই উন্মুক্ত রয়েছে। এবং তা ঠিক সেভাবেই প্রোজ্জ্বল ও প্রকাশিত রয়েছে যেমন তা ছিল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের যামানায়। এছাড়া, একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কথা তার দৃঢ়চিত্ততা বা হিম্মতের অনুপাতে হয়ে থাকে। তার সংকল্প, তার দৃঢ়তা, তার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব যেমন হবে, তেমনিই হবে তার কথা। অতএব, ঐশীবাণী বা আল্লাহ্‌র ওহীর বৈশিষ্ট্যেও অনুরূপ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁর ওহী আসে, সেই ব্যক্তির হিম্মত বা দৃঢ়চিত্ততা যেমন হয় তেমনই অর্থাৎ তদনুপাতেই সে ওহী লাভ করে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের হিম্মত, তাঁর যোগ্যতা ও ক্ষমতা, তাঁর সংকল্প ও অবিচলতার পরিধি যেহেতু অত্যধিক প্রসারিত ছিল, সেহেতু তিনি যে বাণী লাভ করেছেন, তা-ও সেই অনুপাতে সেই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। এবং এইরূপ হিম্মত ও সাহসিকতার দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আর পয়দা হবে না। কেননা, তাঁর

আহ্বান বা দাওয়াত কোন বিশেষ সময়ের জন্য ছিল না, ছিল না কোন বিশেষ জাতির জন্য, যেমনটা ছিল তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে। বরং তাঁর (সাঃ) জন্য বলা হয়েছে :

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

'বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের সকলের প্রতি। *–৭:১৫৯।*

এবং আরও বলা হয়েছে : وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

'আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। ২১ঃ ১০৮। যে ব্যক্তির আবির্ভাবের ও রেসালতের পরিধি এত বেশী ব্যাপক তার মোকাবেলা করবে কে? এই যুগেও যদি কারো প্রতি কোরআন শরীফের কোন আয়াত নাযিল হয়, তাহলে, সে ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস এটাই যে, তার সেই ইল্‌হাম-এর পরিধি এত বেশী সম্প্রসারিত হবে না, যতটা হয়েছিল এবং হয়ে আছে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে।' *(মলফুযাত, খ. ৩, পৃ. ৫৭)*

(৮)

'কোন জিনিস যদি কেবল খোদাতায়ালার পূর্ণ-পারফেক্ট ক্ষমতার দ্বারা অস্তিত্ববান হয়, তা সেই জিনিস তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্য থেকেই কোন সৃষ্টি হোক, আর তাঁর কেতাবসমূহের মধ্য থেকেই কোন কেতাব হোক যা আক্ষরিকভাবে এবং অর্থগতভাবে তাঁরই পক্ষ থেকে আগত; তাহলে তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যে, তার ঠিক অনুরূপ কোন কিছু বানাবার ক্ষমতা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কারোই থাকবে না। এবং এই যে সাধারণ নীতি তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অস্তিত্ব লাভকারী সবকিছুর সঙ্গেই সম্পর্কিত। এবং এটা প্রমাণিত হয় দু'ভাবে :

এক,–অবরোহী (Deductive) পদ্ধতিতে,–

তবে, অবরোহী এবং আরোহী (Inductive) যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন, খোদার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া জরুরী যে, খোদাতায়ালা তাঁর সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে এবং তাঁর কার্যপ্রণালীতে এক ও অদ্বিতীয় হবেন, অংশীদারবিহীন বা লাশরীক হবেন। এবং তাঁর কোন সৃষ্টিতে, কোন কথায়, কোন কাজে সৃষ্ট কোন কিছুর অংশীদারিত্ব বৈধ নয়। এর পক্ষে প্রমাণ এটাই যে, যদি তাঁর কোন সৃষ্টি বা কথায় বা কাজে সৃষ্ট কোন কিছুর অংশীদারিত্ব বৈধ বা জায়েয হয় তাহলে স্বাভাবিক কারণেই সেই অংশীদারিত্ব তাঁর গুণাবলীতে এবং তাঁর কর্মকাণ্ডেও বৈধ বলে মানতে হবে। আর যদি তা তাঁর গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে জায়েয হয়, তাহলে দ্বিতীয় কোন খোদারও পয়দা হওয়া জায়েয হয়ে যাবে। কেননা, যার মধ্যে খোদাতায়ালার সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে, তাকেই বলা হবে খোদা। আর যদি কারো মধ্যে খোদাতায়ালার কিছু কিছু গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে তাহলে সেই সেই গুণাবলীর ক্ষেত্রে সে খোদার অংশীদার হবে। যদিও, এইরূপ অংশীদারিত্ব সম্পূর্ণ যুক্তিবিরোধী কথা। অতএব, এই দলীল দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা তাঁর তামাম গুণাবলীতে, কথায় এবং কাজে ওয়াহেদ ও লা-শরীক, এক ও অংশীদারহীন। এবং এটা তাঁর জন্যে জরুরী। এবং তাঁর সত্তা ঐ সমস্ত অসঙ্গত ও অযোগ্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র যা তাঁর কোন অংশীদার থাকার বা হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে,–আরোহী (Inductive) বা আরোহী পদ্ধতির যুক্তি বা প্রমাণ (Reasoning from Induction)।

আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটি জিনিসকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, মানুষ তার ক্ষমতা দ্বারা তার কোন একটাকেও সৃষ্টি করতে পারবে না, এমনকি একটা মশা-মাছি বা মাকড়শাও না। বরং, ঐ সবকিছুর গড়ন-গঠনের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে তার মধ্যে এমনসব বিস্ময়কর বিষয় গোচরীভূত হয়, যা থেকে নিশ্চিতরূপেই এই বিশ্বজগতের স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় সুস্পষ্টরূপে। এই সমস্ত যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারেন যে, খোদাতায়ালা স্বীয় ক্ষমতা বলে যা সৃষ্টি করেছেন, তা যদি খোদা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হতো, তাহলে সৃষ্টির কোন অংশকেই সেই হকীকি বা সত্য স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করান যেতো না, এবং তাতে বিশ্বজগতের স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কিত সমস্ত উপলব্ধিই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়তো। কেননা, খোদাতায়ালার সৃষ্টি থেকে কোন কোন বস্তুকে যদি অপর কেউ সৃষ্টি করতে পারতো, তাহলে, এই কথার কি প্রমাণ থাকতো যে, সে অন্য সমস্ত কিছুকেও সৃষ্টি করতে পারবে না? এখন, যখন শক্তিশালী যুক্তি দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, খোদাতায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুই অতুলনীয় এবং যখন সেগুলির অতুলনীয় হওয়াটাও অকাট্যরূপে প্রমাণিত যে, সেগুলি খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে এবং খোদাতায়ালার দ্বারাই সৃষ্ট, তখন, এই সত্য-যাচাই বা তাহকীক করা থেকে সেই সমস্ত লোকের সেই মিথ্যা বা অযৌক্তিক প্রস্তাবনা নাকচ হয়ে যায় যাতে তারা বলে থাকে যে, কালামে ইলাহী বা ঐশীবাণীর অতুলনীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং তা অতুলনীয় হলেও তাতে প্রমাণিত হয় না যে, আসলে তা খোদারই কালাম।...অতএব, এই সমস্ত সত্য যাচাই থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অতুলনীয় বা বেনযীর হওয়াটা, সত্যতার দিক থেকে এবং গুণগত দিক থেকে, খোদার কথা ও কাজের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে, খোদার খোদায়ী জানার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, খোদাতায়ালার কাছ থেকে যা কিছু এসেছে বা সৃষ্ট হয়েছে, তার প্রত্যেকটির মধ্যে অতুলনীয়তা বিদ্যমান। এবং তা থেকেই অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় খোদাতায়ালার একত্ব বা তৌহীদ। এই উপায় বা এই প্রমাণ যদি না থাকতো তাহলে খোদার কাছে পৌঁছুবার জন্যে যুক্তি-বুদ্ধির রাস্তাও বন্ধ হয়ে যেতো।'...

(বরাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ১৩৯–১৭২)।

(১০)

'কোরআন শরীফ হচ্ছে সেই গ্রন্থ যা তার নিজের মাহাত্ম্য, নিজের জ্ঞান প্রজ্ঞা, নিজের সত্যতা, নিজের রচনাশৈলীর সৌন্দর্য, শব্দচয়ন, স্টাইল এবং নিজের আধ্যাত্মিক আলোরাশি সম্পর্কে নিজেই দাবী করেছে, এবং সেই সঙ্গে নিজের তুলনাবিহীন হওয়ার কথাও নিজেই প্রকাশিত করেছে। একথা কখনোই ঠিক নয় যে, কেবল মুসলমানরাই শুধু তাদের ধারণার বশবর্তী হয়ে এই কেতাবের গুণাবলীর কথা, ঔৎকর্ষের কথা প্রকাশ করেছে। বরং, এই কেতাব স্বয়ং তার নিজের উৎকর্ষতার কথা, পূর্ণতার কথা, সৌন্দর্যের কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। এবং সে তার অনন্যসাধারণ হওয়ার এবং অতুলনীয় হওয়ার

কথা সারা সৃষ্টির মোকাবেলায় পেশ করে চলেছে। এবং বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা দিচ্ছে: আছে কি কোথাও কোন প্রতিদ্বন্দ্বী? এর সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী এবং সত্যতা মাত্র দুটো-তিনটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হলে, অজ্ঞ বা নাদান ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারতো। বরং এর সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী তো উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত এবং এ হচ্ছে তারা-ভরা আকাশের ন্যায়, যেদিকেই তাকাও না কেন সেদিকেই জ্যোতির বিচ্ছুরণ দেখতে পাবে। এমন কোন সত্যতা নেই যা তার বাইরে আছে। এমন কোন জ্ঞান নেই, হিকমত নেই যা এর সর্বব্যাপী বর্ণনার অভ্যন্তরে নেই। এমন কোন নূর বা আলো নেই যা এর আনুগত্য করে লাভ করা যায় না। এবং এসব কোন কথার কথা নয়, অপ্রমাণিত নয়। এমন কোন বিষয় নেই, যা শুধু মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ। বরং, তা সবই যাচাইকৃত এবং তার সত্যতা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত। কেননা, তা সবই বিগত তের শ' বছর ধরে আপন জ্যোতির্মালা ক্রমাগতভাবে প্রকাশিত করে চলেছে। আমরাও তার সত্যতার কথা এই কেতাবে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আমরা কোরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী এবং মারেফতকে এমনভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যে, তা যে কোন সত্যান্বেষীকে সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি দান করার জন্য মহাসমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠছে।'

(বরাহীনে আহমদিয়া, পৃ. ৬৪০–৬৪৩, হাশিয়া. ১১)

(১১)

'কোরআন করীমের বুলন্দ শান বা মহান মর্যাদা

কোরআন করীমের নিজের বর্ণনা থেকেই বিঘোষিত।

সমস্ত জ্ঞান কোরআনেই নিহিত ; কিন্তু মানববুদ্ধি তার নাগাল পায় না।

জানা প্রয়োজন যে, এই যামানায় বিপথগামিতার কারণগুলোর মধ্যে একটা বড় কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, কোরআন শরীফের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এখন আর অক্ষুণ্ন নেই। মুসলমানদের একটি দল ভ্রান্ত দর্শনের অনুসারী হয়ে পড়েছে। তারা প্রত্যেকটি বিষয়কে বুদ্ধি ও যুক্তি অর্থাৎ আকল দ্বারাই বিচার করতে চায়। তাদের কথা হচ্ছে, বিরোধ নিষ্পত্তির সবচেয়ে বড় যে মীমাংসাকারী বা হাকাম তা মানুষের মধ্যেই নিহিত এবং তা হচ্ছে আকল্। এই সমস্ত লোক যখন দেখে যে, জিব্রাইল, মিকাঈল ও অন্যান্য সম্মানিত ফেরেশ্তারা, যাদের অস্তিত্বের কথা শরীয়তের কেতাবসমূহে লিখা আছে, এবং জান্নাত ও জাহান্নাম যার অস্তিত্ব কোরআন করীম থেকে প্রমাণিত, এসব কিছুর সত্যতা তাদের যুক্তি দ্বারা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত করা যায় না, তখন তারা তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে অস্বীকার করে বসে এবং আজেবাজে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করে। এবং বলতে থাকে যে, ফেরেশ্তা বলতে এক প্রকার শক্তিকেই বুঝানো হয়েছে এবং রসূলগণের ওহী বা ঐশীবাণী হচ্ছে এক প্রকার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি বা প্রতিভার ফল। আর জান্নাত ও জাহান্নাম হচ্ছে মানসিক শান্তি অথবা শাস্তির নাম। এই বেচারাদের খবরই নেই যে, অজানাকে জানার একমাত্র উপায় যুক্তি-বুদ্ধি বা আকল্ নয়। বরং, অতি উচ্চ স্তরের সত্যতা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের সূক্ষ্ম উপলব্ধি বা মারেফত বুদ্ধি-আকলের নাগালের বহু বহু গুণ উর্ধ্বের ব্যাপার, যা সত্য কাশ্ফ বা দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। সত্যতা যাচাই করার কষ্টিপাথর যদি কেবল যুক্তি বা আকল্ই হয় তাহলে উলুহিয়তের কারখানার বা খোদায়ীর কর্মকাণ্ডের বহু বড় বড়

বিস্ময়কর রহস্যাবলী গুপ্তই থেকে যাবে, থেকে যাবে অনুদ্‌ঘাটিত এবং সূক্ষ্ম উপলব্ধির শৃঙ্খলা বা মারেফতের সিলসিলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে এবং আধ্‌রাই থেকে যাবে; এবং কোন অবস্থাতেই মানুষ সন্দেহ ও সংশয় থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। এই এক তরফা উপলব্ধির শেষ পরিণতি এটাই হবে যে, উর্ধ্ব থেকে পথ নির্দেশের অভাবে এবং উর্ধ্বের শক্তি কর্তৃক প্রবর্তিত চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত কোন প্রকার বুঝ-বুদ্ধি না থাকার কারণে স্বয়ং সেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই নানা রকম কুধারণা মনের মধ্যে সৃষ্টি হবে। সুতরাং শুধুমাত্র বুদ্ধি বা আক্‌ল দ্বারাই খালেকে হাকীকি বা সত্য সৃষ্টিকর্তার সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ বা রহস্যাবলী উন্মোচন করা সম্ভব বলে যে ধারণা, তা যে কত বড় ভ্রান্ত এবং বাজে এবং অর্বাচীন ও অসমর্থনযোগ্য তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় দলভুক্ত লোক হচ্ছে ঐ সকল লোকেরা যারা যুক্তিবুদ্ধি বা আকল্‌কেও সাকল্যে পরিত্যাগ করেছে। একইভাবে তারা কোরআন শরীফকে যা কিনা সমস্ত ঐশীজ্ঞানের জীবন্ত প্রস্রবণ তাকেও পরিত্যাগ করে নির্ভর করে আছে অর্থ হীন কেচ্ছা-কাহিনী আর গাল-গল্পের উপরে অনড়ভাবে। সুতরাং আমরা এই উভয় দলের লোকদের দৃষ্টি এই কথার প্রতি আকর্ষণ করতে চাই যে, তারা যেন কোরআন করীমের মাহাত্ম্যের এবং আলোকের কদর করে এবং এর আলোকের হেদায়াত লাভে আকল্‌-এর ব্যবহার করে, এবং অন্যদের কথা তো বটেই, এমনকি কোন হাদীসও যদি কোরআন করীমের বিরোধী হয়, তাকেও তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন করীমে নিজেই বলেছেন : فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

(অর্থাৎ কোরআন করীমের পর আর কোন্ কথার উপরে তারা ঈমান আনবে?) ৭ঃ১৮৬

সুতরাং, এটা সুস্পষ্ট যে, আমাদের, মুসলমানদের কাছে এখন সব চাইতে বড় অথরিটি এবং নিরংকুশ ও নিশ্চিত অথরিটি হচ্ছে কোরআন করীম। অধিকাংশ হাদীস, যদি সহীহ্‌ও হয় তবু, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত নয়। আর, যা সন্দেহমুক্ত নয়, তার তো সত্যের মোকোবেলায় কোনই মূল্য নেই।

নিম্নে উদ্ধৃত কোরআন করীমের আয়াতগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করো, এবং নিজেরাই ইনসাফের সাথে বলো যে, এই কালামকে বাদ দিয়ে অন্য আর কোন কিছুকে সত্য পথ-প্রদর্শক এবং মীমাংসাকারীরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা।

আয়াতগুলি হচ্ছে : إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

('নিশ্চয় এই কোরআন সেই পথের দিকে পরিচালিত করে যা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ়..) ১৭ঃ১০

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ

('নিশ্চয় এর মধ্যে এবাদতকারী জাতির জন্য এক পয়গাম রয়েছে।') ২১ঃ১০৭।

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

('এবং নিশ্চয় ইহা মুত্তাকীগণের জন্যে অবশ্যই সম্মানসূচক উপদেশ বাণী'।) ৬৯ঃ৪৯

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ

('এবং নিশ্চয় ইহা হাক্কুল ইয়াকীন (বাস্তব ভিত্তিক সত্য সুদৃঢ় বিশ্বাস') -৬৯ ঃ ৫২

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ

('হৃদয়স্পর্শী (সর্বোৎকৃষ্ট) হেকমত-জ্ঞান ও প্রজ্ঞা') -৫৪ ঃ ৬

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

(সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ) -১৬ ঃ ৯০

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ

('আলোর উপর আলো) -২৪ ঃ ৩৬

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

('এবং বক্ষসমূহে যা কিছু (ব্যাধি) রয়েছে তার জন্যে আরোগ্যকারী') -১০ ঃ ৫৮

الرَّحْمَٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝

('তিনি অযাচিত, অসীম দাতা (আল্লাহ্) যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।') ৫৫ঃ২-৩

أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

('সত্যসহকারে আল্‌কিতাব ও আল্‌মিযান (তুলাদণ্ড)অবতীর্ণ করেছেন) ৪২ ঃ ১৮

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

{'মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী)-এর জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ।'} -২ ঃ ১৮৬

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝

('নিশ্চয় ইহা ফয়সলাকারী কালাম।') -৮৬ ঃ ১৪

لَا رَيْبَ فِيهِ

('ইহার মধ্যে কোনই সন্দেহ নেই।') -২ ঃ ৩

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

('এবং আমরা তোমার উপরে এই কেতাব এই জন্যে নাযিল করেছি যাতে তুমি (এর দ্বারা) তাদের নিকট তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা কর যার সম্বন্ধে তারা পরস্পর মতভেদ করেছে এবং আমরা একে (নাযিল করেছি) হেদায়াত এবং রহমতস্বরূপ ঐ জাতির জন্য যারা ঈমান আনে।) -১৬ ঃ ৬৫

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

('যার ভিতরে সন্নিবেশিত আছে স্থায়ী আদেশাবলী।') -৯৮ ঃ ৪

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

('কোন প্রকার মিথ্যা এর নিকটে সম্মুখ থেকেও আসতে পারে না, এবং এর পশ্চাৎ থেকেও না।') -৪১ ঃ ৪৩

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

('এ হচ্ছে মানবজাতির জন্য জ্যোতির্ময় দলীল-প্রমাণ এবং দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত।') -৪৫ ঃ ২১

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ

('অতএব তারা আল্লাহ্ ও তাঁর নিদর্শনাবলী ছাড়া আর কোন্ কথার উপরে ঈমান আনবে?') -৪৫ ঃ ৭

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

('বল, এ সব কিছুই হয়েছে আল্লাহ্‌র ফযলে ও তাঁর রহমতে। সুতরাং,এজন্য তাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। (কেননা,) তারা যা কিছু জমা করছে তার চাইতে ইহা উৎকৃষ্টতর।') -১০ ঃ ৫৯

অর্থাৎ, এই কোরআন সেই পথে পরিচালিত করে যা অত্যন্ত সোজা-সরল। এর মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য সত্যিকারের এবাদতের শিক্ষা আছে যারা এবাদত করতে চায়। যারা মোত্তাকী বা খোদাভীরু তাদেরকে পূর্ণ খোদাভীরুতা বা কামালাতে তাকওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ হচ্ছে সেই হেকমত বা প্রজ্ঞা যা চরমে পৌঁছে গেছে। এ হচ্ছে নিশ্চিত সত্য এবং এর মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিষের বা বিষয়ের বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ আলোর উপরে আলো এবং তা বক্ষসমূহকে ব্যাধিমুক্ত করে। রহমান (অযাচিত-অসীম দাতা) কোরআন শিখিয়েছেন। তিনি এমন কেতাব অবতীর্ণ করেছেন যা আপন সত্তায় সত্য এবং সত্যকে ওজন করার তুলাদন্ড। এ লোকদের জন্য হেদায়াত এবং সামগ্রিক হেদায়াতের বিশদ বর্ণনা। এ নিজের যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ফয়সালাকারী বাণী এবং সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত। একে আমরা এজন্যই তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে এ বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি করে দেয় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমতের সামান তৈরী করে দেয়। এর মধ্যে সেই সমুদয় সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে যা পূর্বের কেতাবগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো ছিঁটানো ছিল। এর মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র অনুপ্রবেশ ঘটেনি, না পূর্বে, না পরে। এ মানুষের জন্য আলোকিত যুক্তি-প্রমাণ। এবং যারা দৃঢ়ভাবে ঈমান এনেছে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। এমন কোন্ সে হাদীস রয়েছে যার প্রতি তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতকে বাদ দিয়েই বিশ্বাস আনবে? যদি কোন হাদীস কোরআন করীমের বিরোধী হয় তবে, তা মানবার প্রয়োজন নেই, বরং তা রদ করে দেওয়াই সমীচীন। তবে, যদি কোন হাদীসের ব্যাখ্যা কোরআন করীমের বয়ানের অনুকূল হয়, তবে তা অবশ্যই মানতে হবে।

তারপর বাকী আয়াতসমূহের মধ্যে বলা হচ্ছে, তাদেরকে বলে দাও যে, খোদাতায়ালার ফযলে ও রহমতে কোরআন এক অতি অমূল্য সম্পদ। অতএব, একে তোমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কর। ঐ সমস্ত মাল থেকে ইহা উত্তম যা তোমরা জমা করে থাকো। এখানে এই কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইল্‌ম ও হেকমত বা শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার মত আর কোন সম্পদ নেই। এ হচ্ছে সেই সম্পদ যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত আছে যে, মসীহ্ পৃথিবীতে এসে এই সম্পদ এতো বেশী বেশী বিতরণ করবেন যে, মানুষ তা নিতে নিতে থেমে যাবে। এ তো হতে পারে না যে, মসীহ সেই দিনার ও

দেরহাম বা পার্থিব ধনসম্পদ জমা করবেন যার সম্পর্কে বলা হয়েছে : নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পত্তি এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি হচ্ছে এক পরীক্ষা *(৮ ঃ ২৯)*; এবং সেই ধন-সম্পদকেই বিতরণ করে করে তিনি মানুষকে ফেৎনায় ফেলবেন। প্রথম মসীহ্-এর স্বভাবের মধ্যেও মাল-সম্পদের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। স্বয়ং ইঞ্জিলের মধ্যেই বর্ণনা করা আছে যে, মুমিনের মাল দিনারও নয়, দেরহামও নয়, বরং সত্যতা ও মারেফত বা সূক্ষ্ম উপলব্ধির মণিমুক্তোই হচ্ছে মুমিনের সম্পদ, এবং এই হচ্ছে সেই সম্পদ যা নবীগণ খোদাতায়ালার কাছ থেকে পেয়ে থাকেন, এবং বিতরণ করে থাকেন। এই সম্পদের দিকে ইশারা করেই আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন :

انما انا قاسم و الله هو المعطي ۔

'নিশ্চয় আমি বিতরণকারী এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন দানকারী।'

হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ সেই সময়ে পৃথিবীতে আগমন করবেন, যখন কোরআনের জ্ঞান পৃথিবী থেকে উঠে যাবে এবং অজ্ঞতা প্রাধান্য বিস্তার করবে। এবং এটাই সেই যামানা যার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে :

لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

'ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে গেলেও তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে পারশ্য-বংশোদ্ভূত ব্যক্তি'। এ হচ্ছে সেই যামানা যার সম্পর্কে কাশ্‌ফী অবস্থায় বা দিব্যদৃষ্টিতে এই আজেযকে জানানো হয়েছে যে, তা হিজরী সনের হিসেবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে যে সময়কালে, তা ধরা আছে এই আয়াতে :

وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٩﴾

('এবং নিশ্চয় আমরা তা উঠিয়ে নিতেও সক্ষম।') -২৩ ঃ ১৯

এই আয়াতের গাণিতিক মানের মধ্যে সেই সময়কাল গুপ্ত আছে এবং তা হচ্ছেঃ ১২৭৪। বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো, তাড়াহুড়া করো না। খোদার কাছে দোয়া করো, তিনি তোমাদের হৃদয় খুলে দিবেন। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই সেই হাদীসমূহের তাৎপর্য বুঝতে পারবে যাতে বর্ণিত আছে যে, আখেরী যামানাতে কোরআন শরীফকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং কোরআনের জ্ঞান হারিয়ে যাবে এবং অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে। ঈমানের প্রেরণা এবং আস্বাদ হৃদয়গুলি থেকে দূর হয়ে যাবে। আবার সেই সব হাদীসের মধ্যে এই হাদীসও আছে যে, ঈমান যদি সুরাইয়া সিতারায়ও উঠে যায়, অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে যখন তার নাম-নিশানাও থাকবে না, তখন পারশ্য বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি তার হাত বাড়িয়ে দেবে এবং সুরাইয়ার নিকট থেকে তা নিয়ে আসবে। এখন তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, এই হাদীস থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যখন অজ্ঞতা এবং বেঈমানী এবং বিভ্রান্তি, যাকে অন্যান্য হাদীসে ধূম্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা সবই পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে পড়বে এবং পৃথিবীতে সত্যিকারের ঈমানদারী এতো কম হয়ে যাবে যে, মনে হবে যেন তা আসমানে উঠে গেছে। এবং কোরআন করীম এমনভাবে পরিত্যক্ত হবে যে, মনে হবে যেন তা খোদাতায়ালার কাছেই উঠে গেছে। এখন, এটা অনিবার্য যে, পারসীদের মধ্য থেকে এক

ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে এবং সে ঈমানকে সুরাইয়ার কাছ থেকে নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবে। অতএব, নিশ্চিত জানবে যে, এই অবতরণকারীই হচ্ছেন ইবনে মরিয়ম।'

(এজালা আওহাম, পৃ. ৩৫২-৩৫৬)

(১২)

'আমি যুবক ছিলাম এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি। লোকেরা একথার সাক্ষী যে, আমি দুনিয়াদারীর কাজে কখনই লিপ্ত ছিলাম না, বরং সব সময়েই ধর্মীয় ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম। আমি এই যে কালাম যার নাম 'কোরআন' তাকে আমি চূড়ান্ত স্তরের পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ পেয়েছি। এই গ্রন্থ না তো কোন মানবকে খোদা বানায়, না আত্মাগুলিকে ও বস্তুকে তাঁর সৃষ্টজগতের বাইরে রেখে, তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করে বা তাঁর নিন্দা করে। সেই যে আশিস ও কল্যাণ যার জন্য ধর্ম গ্রহণ করা হয় তার দ্বারা এই কালাম অবশেষে মানুষের হৃদয় ভরিয়ে দেয়। এবং তাকে খোদার কৃপার অধিকারী বানিয়ে দেয়। অতএব, কী করে আমরা আলো পাওয়ার পরেও অন্ধকারে ফিরে যাব এবং চক্ষু পাওয়ার পরেও অন্ধ হয়ে যাব! -*(সনাতম ধরম, পৃ. ৬,৭)*।

(১৩)

এই সত্য প্রমাণিত যে, কোরআন শরীফ ধর্মকে (দ্বীনকে) পরিপূর্ণ করার কাজ সুসম্পন্ন করেছে। যেমন, তা নিজেই বলেছে :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

{'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে (দ্বীনকে) পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন রূপে মনোনীত করলাম।' *৫:৪*}

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম, এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম, এবং আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়ে সন্তুষ্ট হলাম। অতএব, কোরআন শরীফ-এর পরে আর কোন কেতাবের পা রাখার আর কোন জায়গা নেই। কেননা, মানুষের যতটা প্রয়োজন ছিল তার সবটাই কোরআন শরীফ বর্ণনা করে দিয়েছে। এখন যে ঐশী কালাম বা ওহী-ইল্হাম-এর দরজা খোলা তা আপনা-আপনি নয়। বরং, সত্য এবং পবিত্র কালামসমূহ যা স্বাভাবিকভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে ঐশী সাহায্যে পুষ্ট এবং নানাবিধ গোপন তথ্যে সমৃদ্ধ, তা আত্মার পবিত্রতার পরেই লাভ করা যায়, এবং এইরূপ আত্মার পবিত্রতা অর্জন সম্ভব একমাত্র কোরআন শরীফ ও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমেই।' *(চশমা মারেফত, পৃ. ৭২)*

(১৪)

'মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি ইলহাম-এর জন্য আল্লাহ্র সুন্নত বা নিয়ম, যা কোরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, তা-ই তার নেতা, রক্ষক ও অভিভাবক। এবং এটা সম্ভবই নয় যে, এই সুন্নত ভঙ্গ করে কোন ইলহাম প্রকাশিত হয়। কেননা, তাতে ঐশী গ্রন্থাদিকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে।' *-(তবলীগে রেসালাত, খ. ৩, পৃ. ১৫৬)*

'জানা প্রয়োজন যে, কোরআন করীমের সুস্পষ্ট মোজেযা বা অলৌকিকত্ব যা প্রত্যেক জাতির কাছে, প্রত্যেক ভাষাভাষীর কাছে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পেশ করে আমরা প্রত্যেক দেশের মানুষকে, তা সে হিন্দুস্থানী হোক, পারসীয় হোক, ইয়োরোপীয়ান হোক, আমেরিকান বা অন্য যে কোন দেশবাসী হোক, সবাইকে লা জওয়াব করে দিতে পারি। আল্ কোরআনের সেই সীমাহীন মারেফত সুক্ষ্মতত্ত্বাবলী, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রত্যেক যুগেই সেইযুগের চাহিদা অনুযায়ী উন্মোচিত হয়ে চলেছে, এবং প্রত্যেক যুগের ভ্রান্ত চিন্তাকে প্রতিহত করার জন্য সশস্ত্র সৈনিকের ন্যায় দণ্ডায়মান রয়েছে। যদি কোরআন শরীফ তার সত্যতায় এবং তত্ত্বাবলীতে সীমাবদ্ধ কোন গ্রন্থ হতো, তাহলে একে কোনমতেই পূর্ণ মোজেযা বলা যেত না। শুধু রচনাশৈলীর সৌন্দর্য তো এমন বিষয় হতে পারে না যার জন্য তার অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাবলী শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে মুগ্ধ করতে পারে। এর সুস্পষ্ট মোজেযা তো হচ্ছে এর অভ্যন্তরে রয়েছে অন্তহীন মারেফত ও সুক্ষ্মতত্ত্ব ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা। যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের এই অলৌকিকত্ব অস্বীকার করে সে কোরআনী জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যে ব্যক্তি আল্ কোরআনের এই মোজেযায় বিশ্বাসী নয়, সে কোরআন করীমের উচ্চ অবস্থান সম্পর্কে কোন ধারণাই পোষণ করতে পারে না, সে খোদাকেও সেইভাবে চিনতে পারে না যেভাবে তাঁকে চেনা উচিত, সে রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-কেও সেই ভাবে সম্মান করতে পারে না, যেভাবে তাঁকে সম্মান করা উচিত।

হে খোদার বান্দারা! নিশ্চিতরূপে মনে রেখো যে, কোরআন শরীফের অনন্ত অফুরন্ত মারেফত ও সত্যতা ও তত্ত্বাবলীর অলৌকিকত্ব এত সফল ও পরিপূর্ণ অলৌকিকত্ব যে, তা প্রত্যেক যুগেই তরবারির চাইতে অনেক বেশী কাজ করেছে, অধিক শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্যেক যামানায় নব নব অবস্থার প্রেক্ষাপটে যে সকল সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির দাবী করা হয়েছে তা সব কিছুরই ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে, সেগুলোকে খণ্ডন করে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়েছে আল্ কোরআন। এবং অনুরূপ সব কিছুকেই মোকাবেলা করবার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে কোরআন শরীফে। যে কোন ব্যক্তি, তা তিনি ব্রাহ্ম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীই হোন, বা আর্যই হোন, বা অন্য কোন দর্শনের অনুসারীই হোন না কেন, এমন কোন ঐশী সত্যতা প্রদর্শন করতে পারবেন না, যা কোন শরীফে মজুদ নেই। কোরআন শরীফের রহস্য বা বিস্ময়সমূহ শেষ হবার নয়। যেমন প্রকৃতির গ্রন্থের বিস্ময়কর রহস্যাবলীর উদ্ঘাটন বিশেষ কোন যামানায় শেষ হয়ে যায়নি, এবং নতুন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েই চলেছে, তেমনি এই পবিত্র গ্রন্থের অর্থাৎ কোরআন করীমেরও অবস্থাও তদ্রূপ। এতে করে এও প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালার কথা ও কাজের মধ্যে কোন বিরোধ বা কোন অসামঞ্জস্য নেই। আমি ইতোপূর্বে লিখেছি যে, কোরআন শরীফের রহস্যাবলী প্রায়ই আমার কাছে ইল্হাম (ঐশীবাণী) যোগে প্রকাশিত করা হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন হয় যে, তফসীর গ্রন্থগুলিতে সেগুলির নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই আযেযের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, আদমের সৃষ্টি থেকে নিয়ে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত যে সময় কেটে গেছে তার হিসাব নিহিত আছে 'সূরাতুল আসর'-এর অক্ষরসমূহের গাণিতিক মানের মধ্যে, এবং সেই সময়কাল হচ্ছে ৪৭৪০ (চার হাজার সাত শ' চল্লিশ) বছর। এখন বল তো এই যে, কোরআনী সূক্ষ্মতত্ত্ব যার মধ্য দিয়ে কোরআন করীমের

এক মোজেযা প্রকাশিত হয়েছে, তা কোন ভাষ্য বা তফসীরে লিখিত আছে নাকি? এমনিভাবে, খোদা তায়ালা আমার উপরে কোরআনী মারেফতের এই সূক্ষ্মতত্ত্বও উন্মোচিত করেছেন যে, إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ নিশ্চয় আমরা ইহা অবতীর্ণ করেছি লায়লাতুল কদর'–এ (ফয়সালার রাত্রিতে), এর অর্থ শুধু এতটুকুই নয় যে, সে ছিল এক বরকতের রাত, যে রাতে কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল বরং এই অর্থ ছাড়াও, যা এক সঠিক অর্থ বটে, এই আয়াতের অভ্যন্তরে আরও এক অর্থ নিহিত আছে যা আমি আমার একটি পুস্তিকা 'ফতেহ্ ইসলাম'-এর মধ্যে বর্ণনা করেছি। এখন বল, এই সমস্ত সত্য ও সূক্ষ্ম মারেফত কোন্ তফসীরের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে? একথা মনে রাখতে হবে যে, কোরআন শরীফের কোন কথার এক অর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন দ্বিতীয় অর্থ করা হয়, তাহলে এই উভয় অর্থের মধ্যে না কোন পরস্পর বিরোধিতা সৃষ্টি হয়, না এতে কোরআনী হেদায়াত ও তাৎপর্যের মধ্যে কোন কমবেশী সৃষ্টি হয়। বরং তা এক আলোর সঙ্গে আর এক আলো মিলিত হয়ে কোরআনের মাহাত্ম্যকে আরো বেশী উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করে। এবং যেহেতু সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে অগণিত চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব ঘটেছে, সেহেতু নতুন পদ্ধতিতে, নতুন নতুন জ্ঞান প্রকাশ করে সমস্ত নতুন নতুন বেদাত বা উদ্ভাবনা প্রভৃতি খন্ডন বা বাতিল প্রমাণিত করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় এই কেতাব, যা কিনা 'খাতামুল কুতুব' (কেতাবসমূহের মোহর) হওয়ার দাবী করে তা যদি যামানার প্রতিটি অবস্থার তদারকি না করে, তাহলে তো সে কোনভাবেই খাতামুল কুতুব হওয়ার দাবী করতে পারে না। আর যদি এই কেতাবের মধ্যে গুপ্তভাবে সেই সকল বিষয়াদি বিদ্যমান থাকে, যা প্রত্যেক যামানার প্রতিটি অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন, তাহলে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, কোরআন নিঃসন্দেহে অফুরন্ত জ্ঞান দ্বারা ভরপুর এবং প্রত্যেক যুগের জন্য যথোপযুক্ত সমাধান দিতে সক্ষম, প্রতিটি যুগের প্রতিটি অবস্থার তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম।

এখন একথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্তায়ালার নিয়ম হচ্ছে তিনি প্রত্যেক কামেল মুলহেম বা ঋদ্ধ ঐশীবাণী-প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে কোরআনের গুপ্ত রহস্যাবলী উন্মোচিত করে থাকেন। বরং কোন কোন সময় তিনি কোন মুলহেম-এর হৃদয়ে কোরআন শরীফের আয়াত ইলহামের আকারে অবতীর্ণ করে থাকেন। এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই আয়াতের পূর্বের অর্থ ছাড়া নতুন আর এক অর্থ প্রকাশ করে দেওয়া। যেমন, মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব (মরহুম) গযনবী তাঁর এক পত্রে লিখেছেন, আমার উপরে একবার ইলহাম হলো : قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا

('আমরা বললাম, হে আগুন! শীতলতা ও নিরাপত্তার উপায় হয়ে যাও) -২১:৭০

কিন্তু, আমি এর কোন অর্থ বুঝিনি। পুনরায় ইলহাম হলো –'নার'-এর স্থলে 'সবর' শব্দ যোগে।তখন আমি বুঝলাম যে, আগুন বলতে এখানে 'সবর'কে বুঝানো হয়েছে।'

(ইজালা আওহাম, ১৫৫–১৬২)

(১৬)

'এই সেই যামানা যখন হাজারো ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে। কিন্তু, আল্লাহতায়ালা বলছেন : وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

('এবং এমন কোন বস্তু নেই যার (অফুরন্ত) ভান্ডারসমূহ আমাদের নিকটে নেই এবং আমরা তা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যতীত অবতীর্ণ করি না।') -১৫ ঃ ২২

অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিষের অফুরন্ত সম্পদ আমাদের নিকটে রয়েছে, তবে তা পরিমাণ মত এবং প্রয়োজন মত আমরা অবতীর্ণ করে থাকি। সুতরাং যে পরিমাণ জ্ঞান ও মারেফত ও সত্য-তত্ত্বাবলী কোরআনের মধ্যে নিহিত রয়েছে যা প্রত্যেক প্রকারের দার্শনিক ও অদার্শনিক ধর্মকে পরাভূত করে পরাজিত করে তার সবটাই প্রকাশিত হওয়ার যামানা ছিল এটাই। কেননা, প্রয়োজনের উদ্ভব হওয়া ব্যতীত তার প্রকাশ হতে পারে না। সুতরাং এখন যখন নতুন দর্শনের পথ থেকে বিরুদ্ধবাদিতার হামলা হয়ে গেছে, তখন ঐ সমস্ত সূক্ষ্মজ্ঞানের ও উপলব্ধির প্রকাশিত হওয়ার সময়ও এসে গেছে। এবং এটা সম্ভবই না যে, ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর জ্ঞান প্রকাশিত করা ছাড়া ইসলাম সমস্ত বাতিল ধর্মের উপরে জয়লাভ করবে। কেননা, তরবারির বিজয় কোন ব্যাপারই না; কিছুদিনের ক্ষমতাভোগের পর তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিজয়েরও বিলুপ্তি ঘটে যায়। সত্য এবং প্রকৃত বিজয় তা-ই যা অর্জিত হয় মারেফত, সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী ও কামেল সত্যতার সৈনিকদের হাতে। এবং এটাই সেই বিজয় যা ইসলাম আজ অর্জন করে চলেছে। সন্দেহ নেই, এর ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল এই যামানা সম্পর্কেই। এবং অতীতের সাধু ব্যক্তিদের উপলব্ধিও এটাই ছিল, এবং এটাই তাঁরা প্রকাশও করে গেছেন, বুঝিয়ে গেছেন।

এই যামানা বস্তুতঃ এমন এক যামানা যা দাবী করছে যে, কোরআন শরীফের অভ্যন্তরে যা কিছু গোপনভাবে সঞ্চিত আছে তা সবই সে প্রকাশিত করে দিক.................। একথা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রত্যেকটি সৃষ্টি বিস্ময়কর সব বৈশিষ্ট্য ও রহস্যাবলীতে পরিপূর্ণ। যদি কেউ একটা মাছিরও বৈশিষ্ট্য ও রহস্যাবলী জানার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যায় তবু সে তার সবকিছুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবে না। তাহলে কি বলতে হবে যে, কোরআন করীমের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও রহস্যাবলী একটা মাছির চাইতেও কম? সন্দেহ নেই, আল্ কোরআনের সমস্ত বিস্ময়কর রহস্যাবলী সারা সৃষ্টির সমস্ত বিস্ময় ও রহস্য একত্রীভুত করলেও তার চাইতে অনেক বেশী হবে। এবং ঐগুলিকে অস্বীকার করা প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআর করীমের আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হওয়াকেই অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা, পৃথিবীতে এমন কোন কিছুই নেই যা খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে, অথচ তার মধ্যে অন্তহীন রহস্যাবলী নেই.....................ঐ সমস্ত সত্যতা এবং সূক্ষ্ম রহস্যাবলী যা মারেফতের জ্ঞান ও উপলব্ধিকে বৃদ্ধি করে তা সব সময়ই প্রয়োজন মত প্রকাশিত হয়। নতুন নতুন ফাসাদের সৃষ্টি হয়, বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, আর তখন নতুন নতুন হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ অর্থ ও তাৎপর্যেরও প্রকাশ ঘটে। এ তো প্রকাশিত সত্য যে, কোরআন করীম তার সত্তায় স্বয়ং মোজেযা। এর এক বিরাট বিস্ময় হচ্ছে যাবতীয় সত্যতাই এর ভিতরে সঞ্চিত রয়েছে সীমাহীনভাবে। কিন্তু অসময়ে তা কখনই প্রকাশিত হয় না। যখন সেরূপ

অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তখন তার চাহিদা মোতাবেক সেরূপই মারেফত বা সূক্ষ্ম উপলব্ধির জ্ঞান তা থেকে প্রকাশিত হয়। দেখো, পার্থিব জ্ঞান যেগুলি প্রায় ক্ষেত্রে কোরআন করীমের বিরোধী এবং মানুষকে গাফলতির মধ্যে ফেলে রাখে বা ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন করে তোলে, সেগুলিও আজকাল কত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এবং যামানা তার গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে কত বিস্ময়কর সব পরিবর্তন সাধন করছে। তাহলে কি এই নাজুক যামানায় এটা প্রয়োজন ছিল না যে, ঈমানী এবং ইরফানী জ্ঞান-প্রজ্ঞার উন্নতিরও দ্বার উন্মুক্ত করা হোক। এবং খোদাতায়ালা সংকল্প করেছেন যে, তিনি এই দুনিয়ার যাবতীয় অহংকারী উদ্ধত দর্শনের উপরে কোরআন করীমের গোপন ও বিস্ময়কর রহস্যাবলী প্রকাশিত করে দিবেন। এবং খোদার এই সংকল্পকে অর্ধ-শিক্ষিত মোল্লারা, যারা ইসলামের দুষমন, তারা কোনমতেই ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। তারা যদি তাদের দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এবং তারা রুদ্র খোদার এমন রুদ্ররোষে পতিত হবে যে, তারা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এই সকল নাদানের তো বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি কোনই খেয়াল নেই, কোনই নজর নেই। তারা মনে করে যে, হোক না কোরআন করীম পরাজিত, পরাভূত ও দুর্বল, হোক না তা সকলের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন, তাতে কি যায় আসে? কিন্তু তা এক জঙ্গী বাহাদুরের ন্যায় বেরিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, এক সিংহের মতই ময়দানে বেরিয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর তাবৎ দর্শন গিলে গিলে খাবে। এবং বিজয়কে দেখিয়ে ছাড়বে, এবং لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ সকল ধর্মের উপরে বিজয় লাভ করবার যে ভবিষ্যদ্বাণী তা পূর্ণ করেই দেখাবে। এবং সেই সঙ্গে وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করে দেওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীকেও আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণতা দান করবে। কেননা, পৃথিবীর বুকে ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করা পরিপূর্ণতা ছাড়া জবরদস্তির মাধ্যমে কিছুতেই সম্ভব নয়। ধর্ম পৃথিবীর বুকে তখনই কায়েম হয়, যখন তার মোকাবেলায় অন্য আর কোন ধর্ম দাঁড়াতে পারে না, এবং সকল প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে। অতএব, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন এই সময়কে নাদান মৌলবীরা প্রতিহত করতে চাইলেও আর প্রতিহত করতে পারবে না। এখন সেই ইবনে মরিয়ম, যার আধ্যাত্মিক পিতা এই দুনিয়ার বুকে সত্য শিক্ষক বা মুয়াল্লেমে হকীকি ছাড়া আর কেউ নন, এবং সে এই কারণে আদমের সঙ্গেও সাদৃশ্য রাখে, সে কোরআন করীমের বিপুল সম্পদরাশি মানুষের মধ্যে বিতরণ করবে, এমন কি মানুষ তা গ্রহণ করতে করতে তৃপ্ত হবে, থেমে যাবে এবং لا يقبله احد আর কিছু গ্রহণ করতে না চাওয়ার প্রমাণ হয়ে যাবে, এবং প্রত্যেকেই তা আপন আপন ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপেই গ্রহণ করবে।'

(এজালা আওহাম, পৃ. ৩৬৪–৩৬৭)

(১৭)

'কোরআন শরীফের শিক্ষা পবিত্র এবং পরিপূর্ণ, এবং তা মানব-বৃক্ষের প্রতিটি শাখার পরিচর্যা করে। কোরআন শরীফ কোন এক বিশেষ দিকেই শুধু জোর দেয় না। বরং তা কখনও ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়, এই শর্তে যে, তা যথাযোগ্য ক্ষেত্রেই কেবল প্রয়োগ করা হবে; আবার কখনও তা অপরাধীকে শাস্তিদানের কথাও বলে, এবং তা-ও কেবল যথাযোগ্য ক্ষেত্রেই। অতএব, প্রকৃত প্রস্তাবে কোরআন শরীফ খোদাতায়ালার কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়মেরই এক প্রতিচ্ছবি যা সর্বদাই দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত। একথা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত যে, খোদার কথা ও কাজ হতে হবে পরস্পর সুসমঞ্জস। অর্থাৎ, যে রঙে বা যে আকারে ও প্রকারে পৃথিবীতে খোদার কাজ দৃষ্টিগোচর হয়; এটা জরুরী যে, খোদাতায়ালার সত্য কেতাবও তাঁর সেই কাজ অনুসারেই শিক্ষা দান করবে। এটা হতে পারে না যে, কাজ হবে এক রকম আর কথা হবে অন্য রকম। খোদাতায়ালার কাজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, সব সময়ই বা সব ক্ষেত্রেই নম্রতা ও সহিষ্ণুতা অনুসরণ করা হয় না, বরং অপরাধীদেরকেও সময় সময় শাস্তি দেওয়া হয়, আযাবের মধ্যে ফেলা হয়। এই ধরনের আযাবের উল্লেখ পূর্ববর্তী কেতাবগুলোতেও আছে। আমাদের খোদা শুধু নম্র বা হালীম নন, তিনি বিজ্ঞ বা হাকিমও, এবং তাঁর ক্রোধও ভয়ানক। সত্য কেতাব হচ্ছে সেই কেতাব যা তাঁর প্রকৃতির নিয়ম- এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং সত্য এলাহী কালাম বা ঐশীবাক্য সেটাই যা তাঁর কাজের বিরোধী নয় বা তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা এটা কখনই লক্ষ্য করিনি যে, খোদা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে হামেশাই নম্রতা এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, এবং কখনও কোন আযাব বা শাস্তি দান করেন নি। এমনকি আজও অর্থাৎ এই যামানাতেও নাপাক স্বভাবের লোকদের জন্য খোদাতায়ালা আমার মাধ্যমে এক অতি ভীষণ ও ভয়াবহ ভূমিকম্পের (বা যুদ্ধের) খবর দিয়ে রেখেছেন যা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।'

(চশমা মসীহি, পৃঃ ১২ ঃ ১৩)

(১৮)

'আরও একটি আপত্তি ছিল, যা আমরা উত্থাপন করেছিলাম খৃষ্টানদের প্রচলিত সুসমাচারগুলির (ইঞ্জিলের) বিরুদ্ধে। যার দরুন পাদ্রীসাহেবরা বড় লজ্জায় পড়েছিলেন। এবং সেই আপত্তি ছিল এই যে, ইঞ্জিল মানুষের সকল বৃত্তির (Faculty) বিকাশের সহায়তাকারী হতে পারে না। তার মধ্যে যতটুকু চারিত্রিক গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা-ও নেওয়া হয়েছে তৌরিত থেকে। এতে অনেক খৃষ্টান এই আপত্তি তুলে বলেছিল যে, ঐশীগ্রন্থের সম্পর্ক শুধু নৈতিক গুণাবলীর সঙ্গে। শাস্তি প্রদানের বিষয়টা খোদার কেতাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা,অপরাধের শাস্তি অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রদান করা উচিত। এবং এই অবস্থার কোন নির্ধারিত সীমা নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের মতে শাস্তিদানের জন্য শুধু একটা আইনই যথেষ্ট হতে পারে না, সঠিক হতে পারে না। প্রত্যেকটি শাস্তি হওয়া উচিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এবং অপরাধীকে সতর্কতা জ্ঞাপন ও প্রতিহত করার লক্ষ্যে। সুতরাং একই প্রকারের নির্ধারিত শাস্তিদান চারিত্রিক সংশোধনের জন্য যথোপযুক্ত হতে পারে না। একইভাবে দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং আয়কর বা রাজস্ব সংক্রান্ত আইনগুলিও একই প্রকারের নির্ধারিত থাকা বাঞ্ছনীয়

নয়। এতে করে, অর্থাৎ এই আইনগুলি নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয় হলে তা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, বিশেষ করে যখন কোন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হবে, বা কোন একটা ব্যাপার এমনভাবে প্রচলিত হয়ে পড়বে যে, সরকারের পক্ষেও তা পরিহার করে চলা সম্ভবপর হবে না। কিংবা এই ধরনের আরও কোন নতুন অবস্থারও সৃষ্টি হতে পারে যা তমুদ্দনী অবস্থার উপরেও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। অথবা একই ধরনের শাস্তি পেতে পেতে অপরাধীরা অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং এইরূপ শাস্তি তাদের উপরে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে, কিংবা তারা এইরূপ শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, এই জাতীয় ধারণা পোষণ করা ঐ সকল লোকের পক্ষেই সম্ভব যারা কখনই গভীরভাবে কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করেনি। এখন আমি সত্যান্বেষীদেরকে বলতে চাই যে, কোরআন শরীফের মধ্যে দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং মাল-সম্পত্তি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী বা হুকুম-আহকামকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

এক হচ্ছে, শাস্তি অথবা পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা করা;

দ্বিতীয়, শুধু নীতি (Principles) নির্ধারণ করা এবং সুনির্দিষ্ট করে কোন নির্দেশ দান না করা। এবং দ্বিতীয় আহকাম এই উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে যে, এতে করে উদ্ভূত কোন নতুন পরিস্থিতিতে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষেত্রে পথ-নির্দেশ পাওয়া যাবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোরআন শরীফে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, দাঁতের বদলা দাঁত, চোখের বদলা চোখ। এটা বিস্তারিত বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় আর এক স্থানে এর নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا 'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ'– ৪২ : ৪১। অতএব, যখন আমরা চিন্তা করে দেখি, তখন বুঝতে পারি যে, এই সাধারণ নীতি এজন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে আইনের পরিধি সম্প্রসারিত করা যায়, এবং যেক্ষেত্রে আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান নেই সেখানেও তা প্রয়োগ করা যায়। যেমন ধরুন, এক ব্যক্তির সব দাঁত পড়ে গেছে, সে একজনের একটা দাঁত ভেঙ্গে দিল। এখন, দাঁত-ভাঙ্গার অপরাধে আমরা তো ঐ ব্যক্তির কোন দাঁত ভাঙ্গতে পারবো না, কেননা, তার মুখে তো কোন দাঁতই নেই। অনুরূপভাবে, কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির চোখ নষ্ট করে ফেলে, তবে আমরা সেই অন্ধের চোখ নষ্ট করতে পারবো না। কেননা, তার তো চোখই নেই। সংক্ষেপে, এই সকল ক্ষেত্রের জন্য কোরআন শরীফ শুধু সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, সুনির্দিষ্ট কোন আইনের বিধান দেয়নি; যাতে করে অবস্থা ভেদে বা ক্ষেত্র ভেদে যথাযথ আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, এর আহকাম ও কানুনের বিরুদ্ধে কি করে আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব? এতো শুধু অতটুকুই করেনি, বরং সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়ার মাধ্যমে সবাইকে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রেরণা যুগিয়েছে। কিন্তু আফসোস যে, এই প্রেরণা ও এই পদ্ধতির শিক্ষা তৌরিতের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইঞ্জিল তো এই ধরনের পূর্ণ শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, মাহরুম। ইঞ্জিলের মধ্যে মাত্র কয়েকটি চারিত্রিক গুণের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এবং তা-ও কোন পূর্ণ বিধান বা কোন আইন ব্যবস্থার অংশ নয়। মনে রাখতে হবে যে, খৃষ্টানরা যে

বলে ইঞ্জিল আইনের ব্যাপারগুলো মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার কাছে ছেড়ে দিয়েছে, তা তাদের কোন গৌরবের কথা হতে পারে না, বরং এটা তাদের লজ্জার কথা, অনুতাপের কথা। কেননা, প্রতিটি বিষয় তা সে যত ভালই হোক না কেন, তার সম্পর্কে যদি কোন সাধারণ নীতি বা কোন নিয়ন্ত্রক-বিধান না থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে আইনের অপপ্রয়োগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে; এবং এমনটি হলে, তা অত্যন্ত খারাপ ও কদর্য অবস্থার সৃষ্টি করবে' *(কিতাবুল বারিয়াহ্, পৃঃ ৮৭,৮৮)*

(১৯)

'আমাদের সর্বশক্তিমান খোদা যিনি হৃদয়সমূহের অভ্যন্তরের সমস্ত গোপন রহস্যাবলী অবগত তিনি এই কথার সাক্ষী যে, কোন ব্যক্তি যদি কোরআন শরীফের শিক্ষা থেকে এক পরমাণুর হাজার ভাগেরও একভাগ ত্রুটি বের করতে পারে, কিংবা এর মোকাবেলায় তার কেতাব থেকে এক অণুপরিমাণও এমন উৎকর্ষতা প্রমাণ করতে পারে যা কোরআনী শিক্ষার বরখেলাপ বা তার চেয়ে উত্তম তাহলে, আমরা মৃত্যুদন্ড কবুল করতেও প্রস্তুত।' *(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃঃ ২৮৮, হাশিয়া ২)*

(২০)

'আজ পৃথিবীর বুকে সকল ঐশীগ্রন্থের মধ্যে ফুরকানে মজীদ হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ যার কালামে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র বাণী হওয়া শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। যার নীতিসমূহ নাজাত বা পরিত্রাণের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী এবং মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যার ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদাসমূহ এমন উৎকৃষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তার সত্যতার স্বপক্ষে বহুবিধ প্রকাশ্য প্রমাণ রয়েছে। যার আহকাম বা নির্দেশাবলী সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যার শিক্ষা প্রত্যেক প্রকারের শির্‌ক বা অংশীবাদিতা, বেদাত ও সৃষ্টিপূজা বা সর্বেশ্বরবাদিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যার মধ্যে খোদাতায়ালার একত্ব বা তৌহীদ, খোদাতায়ালার চরম মহিমা এবং সেই সম্মানের অধিপতির উৎকৃষ্ট গুণাবলী প্রকাশিত করবার জন্য প্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে এই সৌন্দর্য বর্তমান যে, এ আগাগোড়া আল্লাহ্‌র একত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ। এ কোনভাবেই কোন কম্‌তি বা ত্রুটি বিচ্যুতি বা কোন অনুপযোগী গুণ স্রষ্টার পবিত্র সত্তায় আরোপ করে না। এ কোন বিশ্বাসকেই জবরদস্তি গ্রহণ করায় না। বরং যে শিক্ষা সে দেয় তার সত্যতার যুক্তি-প্রমাণ সে প্রথমেই উপস্থিত করে। এ তার প্রতিটি উদ্দেশ্যকেই যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। এ তার প্রত্যেকটি নীতির তত্ত্ব ও তাৎপর্যকে যুক্তি যুক্তভাবে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে এবং সে সম্পর্কে মনকে সুদৃঢ় ঈমান ও পূর্ণ মারেফতের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। এবং যে সকল খারাপী, নাপাকী, ত্রুটি, স্খলন ও ফাসাদ বা বিশৃংখলা মানুষের বিশ্বাস, আমল, কথা এবং কাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে তা সাকল্যই উজ্জ্বল যুক্তি-তর্ক দ্বারা বিদূরিত করে। এ ঐ সমস্ত আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় যা মানুষকে মানুষ বানাবার জন্য একান্ত জরুরী। এ প্রত্যেক ফাসাদ বা দুর্নীতিকে তেমনই জোরের সঙ্গে অপসারিত করে যেমন জোরের সঙ্গে তা আজকাল প্রসারিত হয়ে পড়ছে। এর শিক্ষা নিতান্ত সরল, সুদৃঢ়, শক্তিশালী এবং নিরাপদ এবং তা প্রাকৃতিক নিয়ম-এর এক আয়না, এবং মানব স্বভাবের এক প্রতিচ্ছবি। এ হৃদয়ের দৃষ্টিশক্তি এবং আত্মার অন্তর্দৃষ্টির জন্য এক আলো বিকীরণকারী সূর্য। এ বুদ্ধিবৃত্তির সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তোলে এবং তার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অপসারিত করে। কিন্তু, অন্যান্য কেতাবগুলি, যেগুলি

নিজেদেরকে ঐশী বলে দাবী করে, সেগুলির বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেই পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, সেগুলি ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণাবলীর ক্ষেত্রে একেবারেই শূন্যগর্ভ এবং খোদাতায়ালার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সেগুলি নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণায় ভরপুর। এবং ঐ সকল গ্রন্থের অনুসারীরা নানান আজগুবী মতবাদের অনুসরণ করে চলেছে। তাদের মধ্য থেকে কোন কোন ফের্কা বা সম্প্রদায় খোদাতায়ালার স্রষ্টা এবং সর্বশক্তিমান হওয়াকেই অবিশ্বাস করছে, এবং খোদার চিরন্তন ও স্বয়ম্ভু হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভাই বা অংশীদার হয়ে বসে আছে। আর কেউবা বিভিন্ন মূর্তি প্রতিমা ও দেবতাকে খোদার সৃষ্টিকার্যের মধ্যে অংশ নেওয়ার এবং তাঁর রাজত্ব পরিচালনা করার অধিকারী বলে মনে করছে। কেউ বা তাঁর জন্য বেটা, বেটী, নাতি-পুতি তৈরী করছে; আর কেউবা তাঁর পূজো করছে কচ্ছপ ইত্যাদি রূপে। সংক্ষেপে, একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় খোদার পূর্ণ-পারফেক্ট সত্তা সম্পর্কে এমন সব ধারণার সৃষ্টি করছে যে, তিনি যেন এক হতভাগা। এবং তাঁর যেসব উৎকৃষ্ট গুণাবলী থাকা আবশ্যক বলে জ্ঞান -বুদ্ধি দাবী করে, সেগুলি তাঁর মধ্যে নেই। এখন হে আমার ভাইয়েরা! সংক্ষেপে, কথা এটাই যে, যখন আমি লোকদেরকে এই ধরনের বিশ্বাসের মধ্যে বিজড়িত দেখতে পেলাম, এবং তাদেরকে গভীর গোমরাহী ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত দেখলাম, তখন আমার প্রাণ বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হলো, হৃদয় কেঁপে উঠলো, শরীর শিহরিত হলো; এবং আমি তখন তাদেরকে সৎ পথে পরিচালনার জন্য এই পুস্তক প্রণয়নকে আমার জন্য এক অপরিহার্য দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করলাম, যা পূর্ণরূপে পালন না করা পর্যন্ত আমার নিষ্কৃতি নেই।' *(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ৮১-৮৩)।*

(২১)

'ঐ সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ, যা কোরআন শরীফের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বাহ্যিক প্রমাণরূপে স্বীকৃত তা চার প্রকারের। প্রথম প্রমাণ ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত যেগুলি সংশোধনের মুখাপেক্ষী, দ্বিতীয় প্রমাণ ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত যেগুলি পরিপূর্ণ হওয়ার মুখাপেক্ষী। তৃতীয় প্রমাণ যা প্রাকৃতিক বিষয়াদি থেকে উদ্ভূত। চতুর্থ, যা গুপ্ত বিষয়াদি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ কোরআন শরীফের অভ্যন্তরীণ প্রমাণরূপে স্বীকৃত তা-ও সবই প্রাকৃতিক বিষয়াদি থেকেই উদ্ভূত। নিম্নে এগুলির এক এক করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :

(১) 'সংশোধনের মুখাপেক্ষী' বিষয়াদি বলতে বুঝানো হয়েছে কুফরী, বেঈমানী শির্‌ক ও অপকর্মকে। এগুলিকে আদম-সন্তান প্রকৃত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সৎকর্ম ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করেছে। এগুলি সাধারণভাবেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই ঐশীকৃপা এগুলির সংশোধনের জন্য মনোযোগী হয়েছে।

(২) 'পরিপূর্ণ হওয়ার মুখাপেক্ষী' বলতে সেই সমস্ত শিক্ষার কথা বুঝানো হয়েছে, যা (পূর্ববর্তী) ঐশীগ্রন্থগুলিতে ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং যেগুলির সঙ্গে কোন পরিপূর্ণ শিক্ষার তুলনা করলেই সেগুলির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা প্রকটরূপে ধরা পড়ে, এবং একারণেই, সেগুলো এমন একটি ঐশীগ্রন্থের মুখাপেক্ষী, যা সেগুলিকে ত্রুটিমুক্ত করতে পারে এবং সম্পূর্ণতা দিতে পারে।

(৩) 'প্রাকৃতিক বিষয়াদি থেকে উদ্ভূত প্রমাণ দু'ভাগে বিভক্ত :

(ক) বাহ্যিক প্রমাণ : এর দ্বারা ঐ সব বিষয় বা বস্তুকে বুঝানো হয়েছে, যা মানবীয় কোন প্রকার পরিকল্পনা ও তদবীর ছাড়াই খোদার তরফ থেকে সৃষ্টি হয়। যার প্রতিটি পরমাণুতে এমন শান, শওকত, মাহাত্ম্য ও মর্যাদা নিহিত যে, তা মানবীয় যুক্তিবুদ্ধির অতীত ধারণারও অতীত, এবং যার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বুকে নেই।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রমাণ: এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে ঐশীগ্রন্থের সেই সব গড়ন সৌন্দর্য ও তাৎপর্য যার মোকাবেলা করা মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির বা শক্তির সাধ্যাতীত। এবং যা প্রকৃত পক্ষেই অনুপম ও তুলনাহীন হওয়ায় এক সর্বশক্তিমান ও অনন্য অস্তিত্বের প্রমাণ এমনভাবে তুলে ধরে যেন তা সত্যিই খোদা-দর্শনের দর্পণ।

(৪) 'গোপন বিষয়াদি' বলতে বুঝানো হয়েছে সেই প্রমাণকে, যা এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতায় অনুরূপ কোন বয়ান পেশ করতে যে পারবে না, তা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত।

অর্থাৎ এই বিষয়ের উপরে দৃষ্টি দিলে এবং সেই ব্যক্তির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, এটা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে যে,এই বিষয়গুলি না ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক, না তার প্রত্যক্ষণ-পর্যবেক্ষণ দ্বারা আহৃত, না তার চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত, এবং না তার সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করা সম্ভব যে, সে এগুলি অন্য কারো কাছ থেকে শিখেছে। যদিও বিষয়গুলি এমন যে, সেগুলির জ্ঞান অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষেও আহরণ করা সম্ভব। অতএব, এথেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এই গোপন বিষয়াদি হচ্ছে আপেক্ষিক। অর্থাৎ যখন সেগুলি গোপন কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হয়, তখন দেখা যায় যে, সেগুলি গুপ্তজ্ঞানে সমৃদ্ধ, এবং যখন অন্যান্য ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়, তখন সেগুলির সেই বৈশিষ্ট্য যেন আর থাকে না, (অর্থাৎ তারা সেই গুপ্তজ্ঞানের সন্ধান পায় না)।' *–(বারাহীনে আহ্মদীয়া, পৃঃ ১৩৩–১৩৫)*

(২২)

'কোরআন শরীফের এমন অনেক অলৌকিক ক্রিয়া বা মোজেযা ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যেগুলো আমাদের জন্যেও বর্তমান যামানায় প্রকাশ্যরূপেই প্রযোজ্য; এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি এতো সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে, সেগুলিকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এই সব মোজেযা ও ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, যেমন,–

এক, **আযাবী নিশান বা শাস্তি সম্পর্কীয় নিদর্শনের মোজেযা** বা অলৌকিক ক্রিয়া যা প্রদর্শিত হয়েছিল সেই যামানার অবিশ্বাসীদের জন্যে। এবং এসব আমাদের জন্যেও কার্য্যত: এমন নিদর্শন যে, যেগুলিকে চাক্ষুষ বলাই সমীচীন। কারণ, এ ছিল এমন সব সুনিশ্চিত বিষয়ের বা ঘটনাবলীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, যাকে স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের কেউ-ই কোনভাবে অস্বীকার করতে পারে না। প্রথমত: এই যে বিষয়, যা কিনা এই সব মোজেযার বুনিয়াদস্বরূপ, তা অতিশয় প্রকাশ্য এবং সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। এই সকল আযাবী নিশান বা শাস্তির নিদর্শন দেখতে চাওয়া হয়েছিল সেই সময়ে যখন আঁ হযরত

সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর কয়েজন মাত্র সঙ্গী মক্কা নগরীতে সত্য প্রচার-এর কারণে শত শত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। ঐ সময়কালটা ইসলামের জন্য এমন অসহায় ও দুর্বলতার দিন ছিল যে, মক্কার কাফেররা হাসি-ঠাট্টা করতো এবং মুসলমানদেরকে বলতো যে, তোমরা যদি সত্য-এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত তাহলে এতো শাস্তি বালা-মুসিবত, দুঃখ-দুর্দশা তোমরা আমাদের হাতে পাচ্ছ কেন? এবং সেই যে খোদা, যার উপরে তোমরা ভরসা কর, সে কেন তোমাদের সাহায্য করছে না? এবং কেনই বা তোমরা জামায়াত হিসেবে এতো ক্ষুদ্র যে, অদূর ভবিষ্যতে যা কিনা নিচিহ্ন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক? এছাড়া যদি তোমরাই সত্য হয়ে থাক, তাহলে আমাদের উপরে শাস্তি বা আযাব নাযিল হয় না কেন?

এই সকল প্রশ্নের জবাবে কাফেরদেরকে, কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায়, সেই দুঃখ-কষ্ট এবং দুর্যোগ-দুরবস্থার দিনগুলিতে যা বলা হয়েছিল, তা-ও ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্য অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় আর একটি বিষয়। কেননা, সেই সময়কালটা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবাগণ (রাঃ) - এর জন্য এমন এক নাজুক সময় ছিল যে, প্রতিটি মুহূর্তেই প্রাণের ভয় ছিল। এবং চতুর্দিকে অকৃতকার্যতাই পরিদৃষ্ট হতো। এই রকম এক নাজুক সময়ে কাফেরদেরকে তাদের সেই আযাব বা শাস্তির নিদর্শন দেখতে চাওয়ার মোকাবেলায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদেরকে ইসলামের বিজয়ের এবং তোমাদের শাস্তিলাভের নিদর্শন দেখানো হবে। এবং ইসলাম, যার এখন অঙ্কুর উদ্‌গম ঘটেছে মাত্র, তা অচিরেই বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়ে নিজেকে প্রকাশিত করে তুলবে, আর যারা আযাবের নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে তাদেরকে শাণিত তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করা হবে। এবং সমগ্র জজিরাতুল আরবকে কাফের ও কুফরী থেকে মুক্ত করা হবে। এবং গোটা আরবের শাসনভার মুমিনদের হাতে এসে যাবে। এবং খোদাতায়ালা সারা আরবে দ্বীন ইসলামকে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যে, এ দেশে আর কখনই বুৎ-পরস্তি বা পৌত্তলিকতার জন্ম হবে না। এবং বর্তমান অবস্থা, যা এক ভীতির অবস্থা , তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে এবং পূর্ণ নিরাপত্তার ও শান্তির অবস্থা বিরাজ করবে। অতঃপর ইসলাম শক্তিধর হয়ে ওঠবে, বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করতে থাকবে, এবং অন্যান্য দেশেও বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করে চলবে, সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্রয় বিস্তার করে চলবে। এবং দূর দুরান্তের দেশে দেশে তার বিজয় সম্প্রসারিত হতে থাকবে. এবং এক বিশাল সাম্রাজ্য (ইসলামের) কায়েম হয়ে যাবে, যার অস্তিত্ব পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

এখন যে কোন ব্যক্তি এই উভয় বিষয়ের উপরে দৃষ্টিপাত করলে পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারবে যে, সেই সময়কালটা যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তখন তা ইসলামের জন্য কত সংকটের সময় ছিল, কত ব্যর্থতার ও দুঃখ-কষ্টের সময় ছিল এবং যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা-ও তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে কত বেশী বিপরীত ছিল এবং চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার কতবেশী বহির্ভূত বিষয় ছিল, এমনকি

যার পূর্ণতা দৃশ্যতঃ সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও, ইসলামের ইতিহাস যা শত্রু-মিত্র উভয়ের হাতেই মওজুদ রয়েছে, তার উপরে যে কেউ ইন্‌সাফের দৃষ্টিতে তাকালে সে দেখতে পাবে যে, কত পরিষ্কারভাবে সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল, এবং কত বেশী ভীতিপ্রদ প্রভাব তার পড়েছিল মানুষের হৃদয়ের উপরে; এবং প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে তার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতাপ কীরূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছিল। তখন তাকে সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে দৃষ্টি-উন্মুক্তকারী মোজেযা বলেও স্বীকার করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আর সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করবার কোন অবকাশই তার থাকবে না।

কোরআন শরীফের দ্বিতীয় প্রকারের মোজেযা হচ্ছে সেই সমস্ত মোজেযা যেগুলিকে চাক্ষুসরূপেই প্রতীয়মান বলে অভিহিত করতে হয় এবং সেগুলি হচ্ছে সেই সকল বিস্ময়কর ও অসাধারণ পরিবর্তন যা সংগঠিত হয়েছিল রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে; এবং তা সবই সম্ভবপর হয়েছিল কোরআন শরীফের আনুগত্যের কারণে এবং হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বদৌলতে। যখন আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করি যে, ঐ সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কী রকম ছিল, তাদের জীবন-পদ্ধতি কী ছিল, অভ্যাস ও আচার-আচরণ কীরূপ ছিল, এবং পরে হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের সাহচর্য আর কোরআন শরীফের আনুগত্যের ফলে তাদের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, কীভাবে তারা তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস, তাদের চরিত্র , চাল-চলন, কথা-বার্তা, ব্যবহার, তাদের কাজ-কর্ম থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র ও সুশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তখন আমাদেরকে এই অতি মহান প্রভাব দেখে–যা কিনা তাদের জরাজীর্ণ জীবনকে আশ্চর্য সজীবতা দান করেছিল, আলোকিত ও উৎফুল্ল করে তুলেছিল– তা দেখে আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয় যে, এই রূপান্তর এক অনন্য সাধারণ রূপান্তর এবং তা খাস খোদাতায়ালার হাতেই সংঘটিত হয়েছিল। ....এবং এই অসাধারণ ও আমূল পরিবর্তনকে বলতে হবে যে, অবশ্যই এ ছিল এক মোজেযা।

কোরআন শরীফের তৃতীয় প্রকারের মোজেযা, যা আমাদের সামনে মওজুদ রয়েছে, তা হচ্ছে এর বিভিন্ন সত্যতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা-এর নিগূঢ় রহস্যাবলী এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী, এবং তা সবই ভরপুর রয়েছে এর প্রাঞ্জল ও অনবদ্য রচনার মধ্যে। এই মোজেযাকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে কোরআন শরীফে। এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীন ও ইনসান যদি একত্র হয়ে এর সমকক্ষ কোন কিছু রচনা করতে চেষ্টা করে তবে তা কিছুতেই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না *(১৭:৮৯)।* এই মোজেযা এই দলীল দ্বারা সাব্যস্ত এবং পরীক্ষিত ও প্রমাণিত যে, আজও অব্দি তেরশ' বছরের অধিককাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও চতুর্দিকে কোরআন শরীফের প্রকাশনা ও প্রচারণা অব্যাহত থাকার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণাও জোরের সাথে অব্যাহত রয়েছে যে, পারলে কেউ এর সমকক্ষ কিছু রচনা করে দেখাক। কিন্তু অদ্যাবধি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে কেউ অগ্রসর হয়নি। অতএব, এথেকে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, সাকল্য মানবীয় ক্ষমতা কোরআন শরীফের মেকাবেলায় এবং সমকক্ষতায় সম্পূর্ণরূপে অপারগ বরং, যদি কোরআন শরীফের শত শত সৌন্দর্যাবলী থেকে মাত্র একটি সৌন্দর্য

তুলে ধরে তার কোন নজীর পেশ করতে বলা হয় তাহলেও কোন মানুষের পক্ষেই তা পেশ করা সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না তার একাংশেরও কোনও তুলনা উপস্থাপন করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোরআন শরীফের সৌন্দর্যাবলীর মধ্যে একটি সৌন্দর্য হচ্ছে, এর মধ্যে সমস্ত ধর্মীয় মারেফত বা গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা সন্নিবেশিত রয়েছে; এবং ধর্মীয় এমন কোন সত্যতা নেই যা হক্ক ও হেকমত অর্থাৎ সত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোরআন শরীফে বিদ্যমান নেই। এমন কোন সে ব্যক্তি আছে যে দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ দেখায়ে দিতে পারে যে, সেই গ্রন্থের মধ্যেও (কোরআনের) সেই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান?

কোরআন শরীফ ধর্মীয় সমস্ত সত্যতার আধার, এ ব্যাপারে যদি কারো কোনও সন্দেহ থাকে তাহলে সেই সন্দেহ পোষণকারী, তা সে খৃষ্টান হোক, আর্য হোক, ব্রাহ্মণ হোক কিংবা নাস্তিক বা প্রকৃতি-পূজারী যে-ই হোক না কেন, সে নিজস্ব পন্থা ও পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট এবং নিঃসন্দেহ হতে পারে, এবং আমরা তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য জিম্মাদারী নিতেও প্রস্তুত। তবে শর্ত এই যে, সে সত্যান্বেষী হয়ে আমাদের নিকটে আসবে। বাইবেলে যে সকল পবিত্র সত্যতা রয়েছে দার্শনিকদের গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত সত্য ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার কথা আছে যা আমাদের গোচরীভূত হয়েছে, হিন্দুদের বেদ ইত্যাদি গ্রন্থে ঘটনাক্রমে যে সব সত্যতা বর্ণিত হয়েছে কিংবা হয়নি, যেগুলি আমরা দেখেছি, এবং সুফীগণের শত শত কেতাব-পুঁথিতে যে সব হেকমত ও মারেফতের বর্ণনা রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত আছি, তা সমস্তই আমরা পাই কোরআন শরীফে। এই পূর্ণ ও যথোপযুক্ত গবেষণা যা আমরা ত্রিশ বছর যাবৎ চালিয়েছি অতীব পুংখাণুপুংখরূপে এবং সামগ্রিকভাবে তা অত্যন্ত সঠিকরূপে এবং নিশ্চিতরূপে আমাদের সামনে এই সত্য উদ্ঘাটিত করেছে যে, এমন কোন আধ্যাত্মিক সত্যতা বা সাদাকাত নেই, যা আত্মার পরিশুদ্ধতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয় বৃত্তির বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রয়োজন, তার বিবরণ কোরআন শরীফে নেই। এটা শুধু আমাদের অভিজ্ঞতার কথাই নয়, এটা কোরআন শরীফের দাবীও বটে। এবং এটা যে কেবল আমারই দ্বারা পরীক্ষিত একটা সত্য এমন নয়, বরং হাজার হাজার আলেম শুরু থেকেই এই পরীক্ষা চালিয়ে আসছেন এবং সাক্ষ্য দান করছেন যে, এটাই সত্য।

কোরআন শরীফের চতুর্থ মোজেযা হচ্ছে এর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও কার্যকারিতা যা সর্বদাই বিদ্যমান রয়েছে তার অভ্যন্তরে। অর্থাৎ এর আনুগত্যকারীরা আল্লাহ্‌র নিকটে গৃহীত হওয়ার স্তর বা কবুলিয়্যতে ইলাহীর মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাক্যালাপ করার সম্মানে ভূষিত হয়। খোদাতায়ালা তাদের প্রার্থনাসমূহ শোনেন এবং অত্যন্ত মহব্বত ও রহমতের সাথে তাদের প্রার্থনার জবাব দেন। তাদেরকে তিনি গুপ্ত রহস্যাবলী সম্পর্কে, নবীদেরকে অবহিত করার মতই, অবহিত করেন। এবং আপন সমর্থন ও সহায়তার নানা নিদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে অন্য সব সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র করেন। এ হচ্ছে এমন এক নিদর্শন যা কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে কায়েম থাকবে, এবং তা সর্বদাই প্রদর্শিত হয়ে আসছে, এবং এখনও তা মওজুদ রয়েছে, সত্যরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এমন ব্যক্তির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় যাঁদেরকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আপনার বিশেষ সমর্থনের কল্যাণে সহীহ ও সত্য

ইলহাম (ঐশীবাণী) এবং শুভ সংবাদ ও দিব্যদৃষ্টি দানের মাধ্যমে গুপ্ত ও অদৃশ্য বা গায়েবের বিষয়াদি অবহিত করে সম্মানিত করেন।

অতএব, হে সত্যানুসন্ধানী! হে সত্য নিদর্শনের জন্য ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ব্যক্তিগণ! ইনসাফের সঙ্গে লক্ষ্য করো এবং কিছু পবিত্র দৃষ্টি সহকারে অবলোকন করো এবং অনুধাবন করো! যে সকল নিদর্শনের কথা খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন, তা সবই কতই না উচ্চ স্তরের নিদর্শন! এবং কীভাবেই না সেগুলি প্রত্যেক যুগের জন্যই প্রকাশ্যরূপে ও বোধগম্যরূপে বিদ্যমান। পূর্ববর্তী নবীগণের মোজেযার নাম ও নিশানাও বাকী নেই, আছে যা তা শুধু কেচ্ছা আর কাহিনী। খোদাই জানে তাঁদের অস্তিত্ব কতটা সত্য ছিল!' *(তস্‌দীকুন্ নবী, পৃঃ ২০–২৩)।*

(২৩)

'কোরআন করীমের মোজেযা, এবং অতি প্রাকৃতিক বা অনন্য সাধারণ নিদর্শনাবলী চার প্রকারের :

(১) আক্‌লী বা বুদ্ধি সংক্রান্ত মোজেযা,
(২) ইল্‌মী বা জ্ঞান-সম্বন্ধীয় মোজেযা,
(৩) রূহানী বারাকাত বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ সম্পর্কীয় মোজেযা, এবং
(৪) অতি-প্রাকৃতিক বা অতি অসাধারণ বিষয়াবলী সম্পর্কিত মোজেযা।

১, ২, ও ৩ নং-এর মোজেযাগুলি কোরআন শরীফের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি অতীব মর্যাদামণ্ডিত এবং প্রকাশ্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত। এগুলিকে প্রত্যেক যামানাতেই প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকাশ্য বিষয়রূপে প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু ৪ নম্বর-এর মোজেযা, যা কিনা অতি-প্রাকৃত বা বহির্বিষয়াদি সম্পর্কিত, তার সঙ্গে কোরআন শরীফের কোন অন্তর্নিহিত বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এর মধ্যেই পড়ে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ এর মোজেযা। কোরআন শরীফের প্রকৃত মর্যাদা, ঔৎকর্ষ এবং সৌন্দর্য প্রথম তিন শ্রেণীর মোজেযার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বরং প্রতিটি কালামে ইলাহীর বা আল্লাহ্‌র বাণীর মহিমান্বিত নিদর্শন হচ্ছে তার মধ্যে এই তিনও শ্রেণীর মোজেযা দেখতে পাওয়া যায়। এবং কোরআন শরীফের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটি নিদর্শনকেই পাওয়া যায় অতীব পূর্ণতার সঙ্গে এবং উত্তমরূপে। এবং এগুলিকে কোরআন শরীফ প্রমাণরূপে বার বার পেশ করেছে তার অতুলনীয় ও অনন্য সাধারণ হওয়ার স্বপক্ষে। যেমন বলা হয়েছে :

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

'তুমি বল, যদি সকল মানুষ এবং জিন্ এই কোরআনের অনুরূপ কিছু আনবার জন্য সমবেত হয়, তবু তারা এর অনুরূপ কিছু আনতে সক্ষম হবে না, যদি তারা একে অপরের সাহায্যকারীও হয়।' -১৭ ঃ ৮৯

অর্থাৎ ঐ সকল অস্বীকারকারীকে বলে দাও যে, যদি সমস্ত জিন্ ও ইনসান অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিই এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায় যে, এই কোরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে হবে, তাহলে কোনক্রমেই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তারা সক্ষম হবে না এমন কোন কেতাব রচনা করতে যার মধ্যে অনরূপ জাহেরী ও বাতেনী বা প্রকাশ্য ও

গোপন উৎকর্ষতা বিদ্যমান থাকবে। এমনকি, এ ব্যাপারে তারা সবাই একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করলেও (তা করতে সক্ষম হবে না)। পুনরায় অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

'আমরা এই কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দেইনি'-(৬ ঃ ৩৯)

আবার বলা হয়েছে : يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

'...পবিত্র কেতাবসমূহ আবৃত্তি করে যার মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে স্থায়ী আদেশাবলী'-(৯৮ঃ৩-৪)

আবারও অন্যত্র বলা হয়েছে : لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

'যদি আমরা এই কোরআন কোন পর্বতের উপরে নাযিল করতাম, তাহলে তুমি নিশ্চয় সেটাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হতে দেখতে। এবং এই সকল উপমা, আমরা মানব জাতির জন্য বর্ণনা করছি যেন তারা চিন্তা করে।' ৫৯ঃ২২...।

এছাড়াও, অতি-প্রাকৃত বা বাইরের বিষয়াদি সম্পৃক্ত বহু নিদর্শনের বর্ণনাও রয়েছে কোরআন শরীফে। এই শ্রেণীর মোজেযাগুলি হচ্ছে কোরআনের সৌন্দর্যের ঠিক সেই রকম অলংকার যা সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে পরানো হয়। অবশ্য, যা এমনিতেই সুন্দর তার জন্য কোন অলংকারের প্রয়োজন হয় না, যদিও তা সৌন্দর্যের প্রকাশকে কিছুটা বৃদ্ধি করে বটে।

এক্ষেত্রে জানা দরকার যে, বহির্বিষয়াদি বা অতি-প্রাকৃত (তাসাররুফাতে খারেজিয়া) মোজেযাগুলি কোরআন শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে কয়েক প্রকারে ভাগ করে। প্রথম প্রকার তো হলো, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের ইচ্ছাতেই খোদাতায়ালা আসমানের উপরে আপন শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশ দেখিয়েছিলেন এবং চাঁদকে দ্বি-খন্ডিত করেছিলেন।

দ্বিতীয়, সেই অসাধারণ পরিবর্তন যা ভূ-পৃষ্ঠে সংঘটিত করেছিলেন খোদাতায়ালা রসূলে পাক (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে, তা হলো সেই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের অবসান, যে দুর্ভিক্ষ চলেছিল আরবে সাত বছর ধরে যখন দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ শুকনো হাড়-হাড্ডি পর্যন্ত গুঁড়ো করে খেয়েছিল।

তৃতীয়, সেই অলৌকিক প্রভাব যার মাধ্যমে হিজরতের দিনে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করা হয়েছিল কাফেরদের দুষ্কৃতি থেকে। অর্থাৎ, যখন মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামকে হত্যা করবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল, তখন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আপনার সেই পবিত্র নবীকে কাফেরদের ঐ হীন চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন, এবং মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরত করে যাওয়ার নির্দেশ দান করেন। এবং বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করারও শুভ সংবাদ দেন। সেদিন ছিল বুধবার দুপুর প্রচণ্ড গরম যখন এই এবতেলা বা পরীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এই মুসিবতের পরিস্থিতিতে যখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম আকস্মিকভাবে আপন জন্মস্থানের শহর ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হলেন

এবং যখন শত্রুরা তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র গৃহকে ঘিরে ফেলেছিল, তখন এক অতি নিকট আত্মীয়–ভালবাসা আর ঈমান দিয়ে গঠিত ছিল যাঁর সত্তা–তিনি জান বাজি রেখে আঁ হযরত (সাঃ)-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন তাঁরই নির্দেশে। তিনি কাপড় দিয়ে মাথা ও মুখ এমনভাবে মুড়িয়ে শুয়ে থাকলেন যে, দুষমনের গোয়েন্দা-চরেরা যেন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের বেরিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কিছু টের না পায় এবং শায়িত ব্যক্তিকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মনে করে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করে।

অতঃপর, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সেই বিশ্বস্ত ও প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিকে নিজের জায়গায় রেখে চলে গেলেন, তখন কিছু পরে ঐ সব বদমাস লোকগুলো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁর (সাঃ) অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লো যাতে রাস্তায় কোথাও তাঁকে ধরে হত্যা করতে পারে। ঐ সময়ে ঐ বিপদ-সংকুল ভ্রমণে একজন মাত্র একনিষ্ঠ অনুরক্ত প্রাণের দোস্ত ব্যতীত আর কোনও মানুষ ছিল না আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামে সঙ্গে। তবে হ্যাঁ, সব সময়ে ঐ বিপদ-সংকুল সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই মওলা করীম যিনি তাঁর সেই কামেল ওফাদার পরম বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ বান্দাকে এক অতি মহান আজিমুশ্শান সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন এই পৃথিবীর বুকে। তাই, তিনি তাঁর সেই প্রিয়তম বান্দাকে পূর্ণরূপে রক্ষা করার জন্যে বড় বড় অলৌকিক ঘটনাবলী ঐ সফরের পথে প্রদর্শন করেছিলেন যেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে কোরআন শরীফে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামকে কোন একজন শত্রুও দেখতে পায়নি। অথচ তখন সকাল হয়ে গিয়েছিল এবং শত্রুরা সবাই মিলে আঁ হযরত (সাঃ)-এর ঘর ঘেরাও করে রেখেছিল। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন খোদাতায়ালা সূরা ইয়াসীন-এর মধ্যে। ঐ সমস্ত দুষ্কৃতকারীর চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং আঁ হযরত (সাঃ) তাদের মাথার উপরে মাটি ছিটিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলেন। আর একটি অলৌকিক নিদর্শন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁর মাসূম নবী (সাঃ)-এর জন্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং তা হলো, যে গুহার মধ্যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীসহ আত্মগোপন করেছিলেন, সেই গুহার মুখে পর্যন্ত পৌছে যাওয়া সত্ত্বেও শত্রুরা না দেখতে পেয়েছিল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামকে, (না তাঁর সাথীকে)। কেননা, খোদাতায়ালা সেখানে একজোড়া কবুতর পাঠিয়েছিলেন এবং তারা সেই রাতেই সেই গুহার মুখে নীড় বেঁধেছিল এবং ডিমও পেড়েছিল। এবং একইভাবে সেই গুহা মুখে মাকড়সাও জাল বুনেছিল। এসব দেখে শত্রুরা ধোঁকায় পড়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। অন্য আর একটি অলৌকিক ঘটনা হলো, শত্রুদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটিয়ে মদীনার পথে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের পশ্চাদ্ধাবন করছিল এবং সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রায় নাগালের মধ্যেই এসে পড়েছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ)-এর বদ দোয়ার কারণে তার ঘোড়ার চার চারটি পায়ের খুরাই মাটির মধ্যে ঢুকে পড়ে আটকে যায়, ফলে সে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে

যায়। তখন সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁর কাছে পানাহ্ বা নিরাপত্তা চেয়ে ফিরে আসে।

চতুর্থ প্রকারের মোজেযা হলো সেই অসাধারণ অলৌকিক নিদর্শন যখন দুষমনেরা তাদের ব্যর্থতার দরুন মরিয়া হয়ে ওঠেছিল এবং বহু সৈন্য সামান্ত নিয়ে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল; উদ্দেশ্য ছিল তখনকার স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদেরকে একেবারে শেষ করে দেওয়া এবং দ্বীন ইসলামের নাম ও নিশানা মুছে ফেলা। কিন্তু আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একমুষ্ঠি কংকর ও বালু কণা দ্বারা বদর প্রান্তরে দুষমনদের মধ্যে এক ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি করে দেন এবং তাদের পরাজয় সংঘটিত করেন। তাদের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত ও বিতাড়িত করেন। খোদাতায়ালা ঐ সামান্য কিছু কংকর কণার আঘাত দ্বারাই শত্রুর বড় বড় সেনাপতিদের মাথা ঘুরিয়ে দেন, তাদেরকে অন্ধ করে ফেলেন এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন। এবং তারা প্রত্যেকেই ঠিক সেই সেই স্থানেই মরে পড়ে ছিল, যে যে স্থানে তাদের প্রত্যেকের মরে পড়ে থাকার কথা বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বলেছিলেন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

অনুরূপ বহু বিস্ময়কর ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের কথা বর্ণিত আছে কোরআন শরীফে, যেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল অলৌকিক ঘটনা। এবং এগুলি সংঘটিত করার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, আল্লাহ্তায়ালা চেয়েছিলেন, তিনি তাঁর নবী (সাঃ)-কে মিস্কীনী গরীবি এবং এতীমি এবং অসহায় এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় আবির্ভূত করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মাত্র ত্রিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর বুকে বিজয়ীর আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। এবং তিনি তাঁকে (সাঃ) কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট, এবং সিরিয়া, মিশর এবং দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী দেশসমূহের রাজা-বাদশাহ্দের উপরে বিজয় দান করবেন। তিনি তাই ঐ অল্প সময়কালের মধ্যেই তাঁর (সাঃ) বিজয়কে জজিরাতুল আরব থেকে নিয়ে সুদূর জিহুন (ওক্সাস) নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এবং এই সমস্ত দেশেরই ইসলাম গ্রহণের কথা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বলা হয়েছিল কোরআন শরীফে। সেই নিঃসম্বল অবস্থা (মুসলমানদের) এবং পরবর্তীতে তাদের সেই সব অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর বিজয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিজ্ঞ এবং শিক্ষিত ইংরেজরাও এই সাক্ষ্য দান করেছে যে, যত দ্রুততার সঙ্গে ইসলামী রাজত্ব এবং ইসলাম পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে কোথায়ও নেই। প্রকাশ থাকে যে, যে ঘটনার কোন নযীর কোথাও পাওয়া যায় না, তাকেই অন্য কথায় বলা হয় মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা। সংক্ষেপে, মানবীয় ক্ষমতার বহির্ভূত বিষয়াদির মধ্যে পরিবর্তন সাধন যা কিনা মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা তার নানা বিবরণ রয়েছে কোরআন শরীফে। বরং যদি একটু চোখ খুলে দেখ, তাহলে দেখতে পাবে যে, এই পবিত্র বাণী বা কালামের প্রত্যেকটি স্থান থেকেই উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে ঐশী সমর্থনের আওয়াজ।' *(সুরমা চশমা আরিয়া, পৃঃ ১২–১৯, পাদটীকা)*

'সত্য-এর প্রকৃত উপলব্ধি (মারেফতে হাক্কানী) দান করবার জন্য কোরআন শরীফ তিনটি দুয়ার উম্মুক্ত করে দিয়েছে।

এক–**আক্‌লী বা যুক্তির (Reason) দুয়ার**। খোদাতায়ালার অস্তিত্ব এবং তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতা, তাঁর একত্ব বা তৌহীদ, শক্তি, কুদরত, দয়া-দাক্ষিণ্য, চিরস্থায়িত্ব স্বনির্ভরত্ব প্রভৃতি গুণাবলীকে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে যুক্তি-বুদ্ধির সম্পর্ক যতটা থাকা দরকার ঠিক ততটাই যথাযথরূপে ও পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগের এই পন্থায় তর্কশাস্ত্র, বাগ্মিতা, ভাষাশৈলী এবং পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় বিতর্ক-রীতির অনুসরণ ইত্যাদির মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম ও সুকঠিন সমস্যাদির সঠিক সমাধান দেওয়া হয়েছে। এ এক অভূতপূর্ব পন্থা এবং যুক্তি-এর ক্ষেত্রে এক মোজেযা। কেননা, বড় বড় দার্শনিকরা যারা তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবক এবং দর্শনের নিয়ম-নীতির নির্ধারক এবং যারা পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু গবেষণা করেছে, তারা তাদের যুক্তিবুদ্ধির (Reason) সীমাবদ্ধতার দরুন, তাদের জ্ঞানকে তাদের ধর্মের সমর্থনে কাজে লাগাতে পারেনি। এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তিরও সংশোধন করতে পারেনি। অন্যদেরকে কোন ধর্মীয় ফায়দা পৌছাতে পারেনি। বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই নাস্তিক, সংশয়বাদী ও ধর্মবিরোধী বনে গেছে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দুর্বল ও উদাসীন হয়ে গেছে। যারা কিছুটা খোদাতায়ালার প্রতি বিশ্বাসী রয়েছে তারাও সত্যতার সঙ্গে বিপথগামিতার মিশ্রণ ঘটিয়েছে, পবিত্রতার সঙ্গে অপবিত্রতার মিশ্রণ ঘটিয়েছে। এবং অবশেষে হেদায়াতের সঠিক পথ পরিত্যাগ করেছে। অতএব এটাই সেই ঐশীযুক্তি, যা কিনা একপ্রকার মোজেযা, তা প্রমাণাদি পেশ করার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ভুল করেনি এবং জ্ঞানের এই ক্ষেত্রে এমন এক যথার্থ ও সঠিক অবদান রেখেছে যা কখনও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর স্বপক্ষে প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহুর অস্তিত্বের এবং তাঁর একত্ব ও স্রষ্টাত্বের ও অন্যান্য গুণাবলীর এমন বিশদ বর্ণনা কোরআন শরীফ পেশ করেছে যা কোন মানুষের পক্ষেই পেশ করা সম্ভব নয়; এবং কোরআনে বর্ণিত প্রমাণাদির বাইরে নতুন কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করাও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে যদি কারো কোন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাহলে সে যেন আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব, তাঁর তৌহীদ কিংবা তাঁর স্রষ্টাত্ব, কিংবা অন্য কোন গুণসম্পর্কে তার কোন যুক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পেশ করে, যাতে তার মোকাবেলায় কোরআন শরীফ থেকে তার সেই যুক্তির অথবা তার চাইতেও কোন অধিক শক্তিশালী যুক্তি তাকে দেখিয়ে দেওয়া যায়। এবং তা দেখিয়ে দেওয়ার জিম্মাদারিত্ব আমাদেরই। বস্তুতঃ এই দাবী এবং কোরআনের এই প্রশংসা কোন কথার কথা নয়। বরং তা প্রকৃত প্রস্তাবেই সত্য। এবং কোন ব্যক্তি প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্কে এমন কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে পারবে না, যা কোরআন শরীফ পেশ করেনি।

কোরআন শরীফ বহু জায়গায় তার নিজের পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ব্যাপকত্বের দাবী পেশ করেছে...... ।

দ্বিতীয় দরজা মারেফতে ইলাহীর বা ঐশী তত্ত্বোপলব্ধির, যা কোরআন শরীফ খুলে দিয়েছে সম্পূর্ণরূপে, তা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক সূক্ষ্ম বিষয়াদি, যেগুলিকে তাদের অসাধারণ প্রকৃতির কারণে বুদ্ধিবৃত্তিক মোজেযা বলাই সমীচীন। এই সকল জ্ঞানের বিষয় কয়েক প্রকারের। প্রথমতঃ ইলমে মারেফতে দ্বীন বা ধর্মীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান, অর্থাৎ ধর্মীয় সমস্ত উচ্চ মারেফত এবং তৎসম্পর্কিত তাবৎ পবিত্র সত্যতা বা সাদাকাত, এবং ইলমে ইলাহী বা ঐশী জ্ঞান সম্পর্কিত সকল প্রকারের গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান, যার সব কিছুর প্রয়োজন আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য। একই ভাবে নফ্‌সে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মার সর্বপ্রকার রুগ্নতা ও প্রবৃত্তির তাড়না, এবং তার স্থায়ী ও অস্থায়ী যাবতীয় আফত বা দুর্দশার কথা;এবং সেই সঙ্গে এ সব কিছুর নিরাময় ও সংশোধনের বিধি ব্যবস্থা; আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জনের প্রয়োজনীয় পন্থা ও পদ্ধতি; এবং উন্নত চরিত্রের চরমত্ব প্রকাশের চিহ্নসমূহ, বৈশিষ্ট্যাবলী ও এ ব্যাপারে অপরিহার্য বিষয়াবলী; এ সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে কোরআন মজীদে। এবং কোন ব্যক্তির পক্ষেই এমন কোনও সত্যতা এমন কোন ঐশী জ্ঞানের কথা, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছার এমন কোন পথ ও পদ্ধতি, অথবা আল্লাহ্‌র ইবাদতের এমন কোন বিরল ও পবিত্র উপায় ও পদ্ধতি পেশ করা সম্ভবপর হবে না, যা এই পাক কালামের মধ্যে বর্ণিত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে রয়েছে আত্মার বৈশিষ্ট্যাবলী এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদি সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান এই মোজেযাপূর্ণ কালামের মধ্যে এমন ব্যাপক ও পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত রয়েছে যে, এ ব্যাপারে চিন্তা করলে যে কেউ অনুধাবন করতে সমর্থ হবে যে, এই কাজ সর্বশক্তিমান (আল্লাহ্‌) ছাড়া অন্য আর কারো হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ এর মধ্যে রয়েছে, আদি জ্ঞান, পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞান ও অন্যান্য গায়েবের জ্ঞান বা গুপ্ত জ্ঞান, যা কিনা আলেমুল গায়েবের (আল্লাহ্‌র) কালামের এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, যার দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি ও আরাম অর্জিত হয় এবং সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার গোপন জ্ঞানের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, সাব্যস্ত হয়। এই জ্ঞান এতো বিশদরূপে ও প্রতুলরূপে কোরআন শরীফে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীস্থ আর কোনও গ্রন্থই তার মোকাবেলা করতে পারবে না। এছাড়া কোরআন শরীফ ধর্মের সমর্থনে অন্যান্য জ্ঞানেরও খেদমত নিয়েছে অলৌকিকভাবে। যেমন, এই পবিত্র গ্রন্থ তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র এবং ভাষা ও রচনাশৈলীর জ্ঞান ইত্যাদিকে নজরে রেখেছে এবং সেগুলিকে ব্যবহার করেছে ধর্মীয় জ্ঞানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এবং বুঝাবার ক্ষেত্রে; এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে এবং নাদান মূর্খের আপত্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে। এক কথায়, এই সমস্ত বিষয়কেই কোরআন শরীফ ধর্মের খেদমতে এরূপ অসাধারণ পন্থায় বিস্ময়করভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, তা থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তাই ফায়দা উঠাতে পারে।

আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু তাঁর বিশেষ কৃপায় কোরআন শরীফের মধ্যে **মারেফতে এলাহীর যে তৃতীয় দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তা হচ্ছে, বারাকাতে রূহানীয়া বা আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি**, যাকে বলা উচিত (কোরআনের) এজাযে তাসিরি বা

কার্যকারিতার মোজেযা। এ কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছেই গোপন নয় যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি সীমাবদ্ধ উপদ্বীপ এলাকার এক দেশে যার নাম আরব, যা কিনা সব সময়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একান্তে পড়ে ছিল: এই দেশের অধিবাসীরা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জংলী ও জানোয়ারের ন্যায় জীবন যাপন করতো। এবং তারা ধর্ম, ঈমান, হক্কুল্লাহ, হক্কুল এবাদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি হক বা কর্তব্য এবং মানুষের প্রতি হক-এর ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। তারা শত শত বৎসর যাবৎ মূর্তিপূজা ও অন্যান্য অপবিত্র চিন্তা-চেতনার মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় পড়ে ছিল। তারা লাম্পট্য, মদ খাওয়া, জুয়া খেলা প্রভৃতি পাপকর্মের চূড়ান্ত স্তরে নেমে গিয়েছিল। তারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাবি, শিশু-কন্যাহত্যা এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, অপরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, ইত্যাদিকে কোন পাপ কাজ বলেই মনে করতো না। বস্তুত: প্রত্যেক খারাপ অবস্থা, প্রত্যেক প্রকারের অন্ধকার, প্রত্যেক প্রকারের অজ্ঞতা ও অলসতা সাধারণভাবেই আরবদের হৃদয়গুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এবং এই ব্যাপারগুলো এত বেশী প্রকাশ্য ছিল যে, এগুলোকে অস্বীকার করা কোন গোড়া বিরুদ্ধবাদীর পক্ষেও– যদি তার কিছু জানা থাকে এ ব্যাপারে– সম্ভব হবে না। এবং এই বিষয়টিও প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ঐ সমস্ত জাহেল, জংলী ও অপবিত্র প্রকৃতির লোকেরা যখন ইসলামে প্রবেশ করলো এবং কোরআনকে গ্রহণ করলো তখন তারা কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এবং কালামে ইলাহী অর্থাৎ কোরআন করীমের প্রভাব এবং নবীয়ে মাসূম (সাঃ)-এর সঙ্গ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বলতে কি সহসাই সম্পূর্ণরূপে তাদের হৃদয়গুলিকে এমনভাবে পরিবর্তন করে দিল যে, তারা জাহালাত বা অজ্ঞতার পরিবর্তে দ্বীনে মারেফতে বা ধর্মীয় নিগূঢ় জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। এবং দুনিয়ার মহব্বতের বদলে ইলাহী মহব্বতে বা ঐশীপ্রেমে এমনভাবে আত্মহারা হয়ে গেল যে, নিজেদের মাতৃভূমি, নিজেদের ধন-সম্পত্তি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, নিজেদের মান-মর্যাদা, নিজেদের প্রাণের আরাম-আয়েশ সবকিছুকেই আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে বিসর্জন দিয়ে দিল। বস্তুতঃ তাদের জীবনের এই উভয় অবস্থা অর্থাৎ তাদের জীবনের প্রথম অবস্থা এবং পরবর্তী নতুন জীবনের অবস্থা যা ইসলাম গ্রহণের পর তারা লাভ করেছিল, তা কোরআন শরীফে এরূপ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, তা পাঠ করার সময় প্রত্যেক সৎ ও শুদ্ধচিত্তের মানুষের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাহলে, কি ছিল ঐ জিনিষ যা তাদেরকে এত শীঘ্র এক জগৎ থেকে আর এক জগতে উত্তীর্ণ করেছিল? তা ছিল ঐ দু'টি জিনিষ (এক) সেই যে নবীয়ে মা'সূম (সাঃ), যিনি তাঁর স্বীয় পরিত্রকরণ শক্তিতে এমন চরমভাবে শক্তিশালী ছিলেন যে, না ইতোপূর্বে তেমন কেউ ছিলেন, না অতঃপর তেমন কেউ হবেন, (দুই) সর্বশক্তিমান চিরঞ্জীব চিরন্তন খোদাতায়ালার পবিত্র কালাম অর্থাৎ কোরআন করীম, যার মধ্যে ছিল অতীব শক্তিধর ও বিস্ময়কর প্রভাব যা এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে হাজারো প্রকারের অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে এসেছিল। সন্দেহ নেই যে, এই কোরআনী প্রভাব ছিল অলৌকিক। কেননা, পৃথিবীতে এর কোন দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে না যে, এমন প্রভাব আর কোন গ্রন্থ বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। কে আছে এমন যে, সে এই কথার প্রমাণ দিতে পারে যে, কোন

সে গ্রন্থ এইরূপ আশ্চর্য পরিবর্তন ও সংশোধন সাধনে সক্ষম হয়েছিল, যা করেছিল কোরআন শরীফ? ....

লাখো পবিত্রচিত্ত ব্যক্তির এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, **কোরআন শরীফের অনুবর্তিতা করলে বরকতে এলাহী বা ঐশী কল্যাণরাজি হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। এবং মওলা করীম (আল্লাহ্তায়ালা)-এর সঙ্গে তাদের আশ্চর্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।** খোদাতায়ালার আলো এবং **বাণী তাদের হৃদয়ের উপরে পতিত হয়।** গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়। এক প্রকার অটুট আস্থা তারা লাভ করে; এক প্রকার সুদৃঢ় ইয়াকীন অর্থাৎ সুনিশ্চিত বিশ্বাস তাদেরকে দান করা হয়; এবং এক প্রকার লজ্জতে মহব্বতে ইলাহী অর্থাৎ ঐশীপ্রেমের আস্বাদ, যা কিনা লালিত হয় সাক্ষাতের আনন্দ দ্বারা তা তাদের হৃদয়ে স্থাপন করা হয়। তাদের অস্তিত্ব যদি বালা-মুসিবত বা দুঃখ বেদনার হামান-দিস্তার মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়, যদি যাঁতাকল বা পেষণযন্ত্র দিয়ে পিষে ফেলা হয়, তবু তার মধ্য থেকে যে আরক বা যে নির্যাস নির্গত হবে তা খোদাতায়ালার প্রেম ছাড়া আর কিছুই হবে না। দুনিয়া তাদের সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়, তাদের অবস্থান দুনিয়া থেকে বহু দূরে বহু উর্ধ্বে। তাদের প্রতি খোদাতায়ালার যে ব্যবহার তা অলৌকিক। তাদের উপরে প্রমাণিত হয়েছে যে, খোদা আছেন। তাদের উপরে প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি এক। তারা যখন দোয়া করে তখন তিনি তা শোনেন। যখন তারা ডাকে তিনি সাড়া দেন। যখন তারা আশ্রয় চায় তখন তিনি তাদের কাছে দৌড়ে আসেন। তিনি তাদেরকে পিতার চাইতেও বেশী ভালবাসেন। তিনি তাদের ঘরে-দুয়ারে আশিস ও কল্যাণের বা বরকতের বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন। অতএব, তারা তাঁর জাহেরী ও বাতেনী আধ্যাত্মিক ও দৈহিক সমর্থন দ্বারা সনাক্তকৃত হয়, এবং তিনি তাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাহায্য করে থাকেন, কেননা, তারা তাঁর এবং তিনি তাদের। এবং এ সবের কোন কিছুই অপ্রমাণিত নয়।' *(সুরমা চশমা আরিয়া, পৃঃ ২৪–৩১, পাদটীকা)।*

(২৫)

'কোন কোন ব্রাহ্ম সমাজী এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করে থাকে যে, কোরআন শরীফের মধ্যেই যদি কামেল মারেফত বা পারফেক্ট তত্ত্বোপলব্ধি নিহিত থেকে থাকে, তাহলে খোদা কেন তা সকল দেশে সকল প্রাচীন ও নবীন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রকাশ করে দিলেন না? এবং কেনই বা তিনি তাঁর কোটি কোটি সৃষ্টিকে তাঁর প্রকৃত ও পূর্ণ মারেফত এবং সত্য ধর্মমত থেকে বঞ্চিত রাখলেন?

এর জবাব হচ্ছে, এই আপত্তির সৃষ্টি হয়েছে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।... জগত প্রসারী সূর্যের আলোক যদি কোন কোন অন্ধকার স্থানে পতিত না হয় অথবা কেউ কেউ যদি সূর্যকে দেখার পর পেঁচার মত চোখ বন্ধ করে রাখে, তাহলে কি এটাই প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ্ সূর্য সৃষ্টি করেন নি? যদি কোন শুষ্ক যমীনের উপরে বৃষ্টিপাত না হয়, কিংবা যদি এর দ্বারা কোন লবণাক্ত এলাকা উপকৃত না হয়, তাহলে কি এটাই বলতে হবে যে, এই রহমতের বারিধারা আসলে মানুষেরই সৃষ্টি? এই জাতীয় সন্দেহ দূর করার জন্য খোদাতায়ালা স্বয়ং কোরআন শরীফের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন যে, ইলহামে ইলাহীর হেদায়াত অর্থাৎ ঐশীবাণীর সৎপথ প্রদর্শন প্রত্যেক শ্রেণীর মেজাযের

বা স্বভাবের জন্য নয়; বরং তা সেই সমস্ত স্বচ্ছ স্বভাবের জন্যই উপযোগী যাদের মধ্যে রয়েছে ধর্মভীরুতা বা তাকওয়া এবং সৎপ্রবণতার গুণ। এরাই সেই সমস্ত লোক যারা ঐশীবাণীর কামেল হেদায়াত থেকে লাভবান হয় এবং এর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। এবং ঐশীবাণী বা ইলাহী কালাম তাদের কাছে যে কোনভাবেই হোক পৌঁছে যায়। এ প্রসঙ্গে, কোরআন করীমের কিছু আয়াত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

'আলিফ লাম মীম ; এই হচ্ছে সেই কামেল (পূর্ণতম) গ্রন্থ যার মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মুত্তাকীগণের জন্য, যারা গায়েবের (অদৃশ্যের) উপরে ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি তা থেকে খরচ করে।

এবং যারা ঈমান আনে তার উপরে যা তোমার প্রতি নাযিল (অবতীর্ণ) করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল, এবং তারা পরবর্তীকালের উপরেও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

এরাই তাদের প্রতিপালকের পথ থেকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম হবে।

নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে তুমি সতর্ক কর বা সতর্ক না কর তা তাদের জন্যে সমান. তারা ঈমান আনবে না।

আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহের উপর, তাদের কানগুলির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর রয়েছে পর্দা এবং তাদের জন্যে রয়েছে এক মহা আযাব (শাস্তি)। ২ ঃ ২-৮।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

'তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে এক রসূল আবির্ভূত করেছেন যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কেতাব ও হেকমত, যদিও পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

এবং (তিনি তাঁকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য থেকে অন্যদের মধ্যেও যারা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাকে চান দান করেন, এবং আল্লাহ্ সর্বোত্তম ফযল বা অনুগ্রহের অধিকারী।') ৬২ঃ৩-৫।

উদ্ধৃত আয়াতগুলির মধ্য থেকে প্রথমে এই আয়াতের উপরে অর্থাৎ, 'আলিফ লাম মীম, যালিকাল কিতাবু লা রায়বা ফিহে, হুদাল্‌ লিল্‌ মুত্তাকীন'-এর উপরে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। এখানে কত সূক্ষ্মভাবে, কত সুন্দরভাবে অথচ সংক্ষিপ্তাকারে খোদাতায়ালা উত্থাপিত উক্ত আপত্তির জবাব দিয়েছেন। প্রথমে তিনি কোরআন শরীফের অবতরণকর্তার কথা বলেছেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এবং বলেছেন 'আলিফ লাম মীম'–'আমি খোদা, আমি সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী। অর্থাৎ এই গ্রন্থের অবতরণকর্তা আমি, যে আমি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, যার জ্ঞানের সমকক্ষ জ্ঞান অন্য কারো নেই। অতঃপর কোরআন করীমের বস্তুগত কারণের বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার মাহাত্ম্যের দিকে ইশারা করে বলা হয়েছে–'যালিকাল কিতাবু'–'সেই কামেল গ্রন্থ'–অর্থাৎ এ এমন আজিমুশ্‌শান–মহিমান্বিত ও উন্নত মর্যাদার এক কেতাব যার উৎসের বস্তুগত কারণ (Material cause) হচ্ছে ঐশীজ্ঞান বা ইল্‌মে ইলাহী। এই কেতাব সম্পর্কে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, এর উৎস এবং এর প্রস্রবণ হচ্ছে সেই সর্বজ্ঞের চিরন্তন সত্তা। এক্ষেত্রে, আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে–যা কিনা ব্যবহৃত হয়ে থাকে দূরত্ব ও দূরবর্তী কোনকিছু সম্পর্কে–এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই কেতাব উৎসারিত ও প্রকাশিত হয়েছে সেই সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত সত্তার জ্ঞান থেকে যিনি আপন সত্তায় অতুল ও অনুপম, যাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানরাজি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী মানবীয় দৃষ্টি-সীমার নাগালের বাইরে বহুদূরে অবস্থিত।

অতঃপর, এর (কোরআন করীমের) প্রশংসাযোগ্য গঠনের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে : 'লা রায়বা ফিহে–এর মধ্যে কোনও সন্দেহ-সংশয় নেই। অর্থাৎ কোরআন শরীফ তার নিজস্ব সত্তায় দলীল-প্রমাণ ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তের উপরে এরূপ প্রতিষ্ঠিত যে, এর মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ নেই। এ অন্যসব গ্রন্থের মত কোন কথা ও কাহিনীর গ্রন্থ নয়। বরং এ ব্যাপকরূপে সুনিশ্চিত প্রমাণাদি ও সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ। এ আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে পরিষ্কার প্রমাণাদি পেশ করে। **এ স্বয়ং এক মোজেযা, যা সন্দেহ ও সংশয় ভঞ্জনের ক্ষেত্রে শাণিত কৃপাণের ন্যায় কাজ করে। এবং এ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের বিষয়টিকে শুধু 'থাকা দরকার' বলে এক সন্দেহযুক্ত সম্ভাবনার স্তরে উপনীত করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং এই সঠিক ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের স্তরে উপনীত করে যে, 'আছে'**। এ তো গেল তৃতীয় উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্যের কথা।

এইসব উদ্দেশ্য মহিমান্বিত হওয়া সত্ত্বেও যার প্রত্যেকটি নিজস্ব প্রভাব ও সংশোধনের ক্ষেত্রে অতীব কার্যকর, এর চতুর্থ উদ্দেশ্যের কথা অর্থাৎ কোরআন শরীফ নাযিল করার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এই উদ্দেশ্য হচ্ছে পথ প্রদর্শন করা, হেদায়াত দান করা, যা কিনা কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। বলা হয়েছে 'হুদাল্লিল মুত্তাকীনা–অর্থাৎ এই মহাগ্রন্থ কেবল ঐ সকল সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, যারা তাদের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দরুন, সুস্থ যুক্তি-বুদ্ধি, অটুট ধারণা এবং সত্যানুসন্ধানের আগ্রহ এবং তাদের নেক-নিয়্যত বা সৎ উদ্দেশ্যের দরুন, অবশেষে, খোদাতায়ালাকে সনাক্ত করার এবং পরিপূর্ণ খোদাভীরুতা বা কামেল তাকওয়ার স্তরে উপনীত হয়। অর্থাৎ, যাদেরকে খোদা তাঁর আপন আদি জ্ঞানে জানেন যে, তাদের প্রকৃতি এই হেদায়াতের জন্য যথোপযোগী এবং তারা হক্কানী মারেফত বা সত্য তত্ত্বোপলব্ধির ক্ষেত্রে উন্নতি করতে সক্ষম, তারা অবশেষে, এই কেতাব থেকে হেদায়াত লাভ করবে। যেভাবেই হোক এই কেতাব তাদের কাছে পৌঁছুতে থাকবে এবং

তাদের মৃত্যুর পূর্বে খোদা তাদেরকে সত্যপথে আসবার তৌফীক দিবেন। এখন দেখো! খোদাতায়ালা কত পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, যে সমস্ত লোক, খোদাতায়ালার জানামতে, হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য এবং নিজেদের প্রকৃতির মধ্যে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য রাখে তারা অবশ্যই হেদায়াত লাভ করবে। পুনরায়, এইসব আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলিতে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেসকল লোক, খোদাতায়ালার বিবেচনায়, ঈমান আনার যোগ্যতা রাখে তারা এখন মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হলেও পরে আস্তে আস্তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এবং কেবল সেই সমস্ত লোকই বাইরে থেকে যাবে যাদেরকে খোদা ভালভাবেই জানেন যে, তারা ইসলামের সত্যপথ গ্রহণ করবে না। তাদেরকে নসিহত কর বা না কর তারা ঈমান আনবে না। তারা কামেল তাক্ওয়া ও মারেফতের কোন স্তরেই পৌঁছুতে পারবে না।

অতএব, এই আয়াতসমূহে খোদাতায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, কোরআনী হেদায়াত থেকে কেবল তারাই লাভবান হতে পারবে যারা মুত্তাকী এবং যাদের মূল প্রকৃতি অহং বা নফ্সের কোন অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি।..

আর যদি এই প্রশ্ন করো যে, যাদের কাছে ঐশী গ্রন্থ পৌঁছেনি তাদের নাজাত বা পরিত্রাণের কি হবে? এর জবাব হচ্ছে,–এই শ্রেণীর লোকেরা যদি বন্য হয় কিংবা তাদের যদি মানবীয় বুদ্ধি-বিবেচনা বলতে কিছুই না থাকে তাহলে তারা কোন প্রকার প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে, হিসাব নিকাশ থেকেও মুক্ত থাকবে। তারা পাগলদের শ্রেণীভুক্ত, বুদ্ধিশূন্য নির্জ্ঞানদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, যাদের কিছুটা হলেও জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তাদের সেই জ্ঞান-বুদ্ধির অনুপাতেই তাদের হিসাব হবে।'

(বারাহীনে আহ্মদীয়া, পৃ. ১৮৮–১৯৩, পাদটীকা)

(২৬)

'কোরআন শরীফ তৌহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব-এর বীজ যেভাবে আরব, পারস্য, মিশর, সিরিয়া, হিন্দুস্থান, চীন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে বপন করেছে এবং যেভাবে অধিকাংশ স্থান থেকে মূর্তি-পূজা ও নানা প্রকারের সৃষ্টি-পূজার শিকড় উৎপাটিত করেছে, তা এমন এক কাজ যার দৃষ্টান্ত কোন যামানাতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু, এর মোকাবেলায় যখন আমরা বেদ-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, তা শুধু আর্য্যাবর্তেরও সংশোধন করতে পারেনি।' *(চশমা মারেফাত, পৃ. ৬৯)*

(২৭)

'তোমরা হুশিয়ার হয়ে যাও। খোদাতায়ালার শিক্ষা এবং কোরআন করীমের হেদায়াতের বরখেলাফ এক কদমও ফেলিও না। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি যে, যে ব্যক্তি কোরআনের (ছোটবড়) সাত শ' হুকুমের মধ্য থেকে একটা কোন ছোট্ট হুকুমও অমান্য করে সে নাজাতের রাস্তা নিজের হাতেই নিজের জন্য বন্ধ করে দেয়। হকীকি এবং কামেল নাজাত বা সত্য এবং সম্পূর্ণ পরিত্রাণের রাস্তাসমূহ উন্মুক্ত করেছে একমাত্র কোরআন, বাকী সমস্তই ছিল তার ছায়া। অতএব, মনোনিবেশ সহকারে কোরআন পাঠ কর এবং তার সঙ্গে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হও, যেরূপ প্রেম তুমি আর কারো সাথেই করনি। কেননা, খোদা (আমাকে) সম্বোধন করে বলেছেন : اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِى الْقُرْاٰنِ সকল প্রকারের কল্যাণ কোরআনেই নিহিত। এবং এই কথাই তো সত্য। আফসোস! ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা অন্য আর কিছুকে এর উপরে গুরুত্ব দেয়।

তোমাদের সমস্ত মঙ্গল ও পরিত্রাণের প্রস্রবণ আল্ কোরআন। তোমাদের এমন কোন ধর্মীয় বিষয় নেই যা কোরআনে পাওয়া যাবে না। কেয়ামতের দিনে তোমাদের ঈমানের সত্যতা অথবা অলৌকিকতা প্রতিপন্নকারী হবে এই কোরআন। আসমানের নীচে কোরআন ব্যতিরেকে এমন আর কোন কেতাব নেই, যা কোরআনের মধ্যস্থতা ছাড়াই তোমাকে নাজাত দিতে পারে। খোদা তোমাদের প্রতি বড়ই কৃপা করেছেন যে, তিনি কোরআনের মত এক গ্রন্থ তোমাদেরকে দান করেছেন। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি যে, সেই যে কেতাব যা তোমাদের নিকটে পাঠ করা হয়েছে, তা যদি খৃষ্টানদের নিকটে পাঠ করা হতো, তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো না। এবং এই যে হেদায়াতের নেয়ামত যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে তা যদি ইহুদীদেরকে তৌরিতের পরিবর্তে দান করা হতো, তাহলে তাদের কোন কোন ফের্কা বা দল কেয়ামত-এর অস্বীকারকারী হতো না। অতএব, এই নেয়ামতের কদর করো যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে। এ অতি প্রিয় নেয়ামত, অনেক অনেক বড় ধন। যদি কোরআন না আসতো, তাহলে গোটা পৃথিবীটাই একটা নোংরা মাংসপিণ্ডের ন্যায় থেকে যেতো। কোরআনই হচ্ছে সেই কেতাব যার মোকাবেলায় অন্য সমস্ত হেদায়াত তুচ্ছ।' *(কিশ্‌তী-এ-নূহ, পৃ. ৩৬, ৩৭)*

(২৮)

'কোরআন মজীদ তার অনবদ্য ভাষা ও রচনাশৈলীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য, অফুরন্ত জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং মারেফত বা গভীর তত্ত্বোপলব্ধির প্রাচুর্য ছাড়াও আপন কল্যাণময় সত্তার মধ্যে এমন এক রূহানী বা আধ্যাত্মিক প্রভাব রাখে যে, তার সত্যিকার অনুবর্তিতা মানুষকে করে তোলে রূহানী আনন্দে মাতোয়ারা, গোপন আলোকে আলোকিত, তার হৃদয়কে করে সম্প্রসারিত, সে খোদাতায়ালার কবুলিয়্যত বা স্বীকৃতি পায় এবং সে খোদা কর্তৃক সম্বোধিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। এবং তা সেই মানুষের মধ্যে সেই আলোর সৃষ্টি করে এবং সেই অদৃশ্য কৃপারাজি বা গায়েবী ফয়েযসমূহ এবং সেই সুনিশ্চিত সমর্থন তাকে সর্বদা দান করে, যা অন্যদের ক্ষেত্রে কখনই লক্ষ্য করা যায় না। তার প্রতি খোদাতায়ালার তরফ থেকে সুমিষ্ট হৃদয়-প্রশান্তকারী বাণী অবতীর্ণ হতে থাকে। তার কাছে প্রতি মুহূর্তে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে যে, ফুরকানে মজীদের প্রকৃত অনুবর্তিতার ফলে এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্যের ফলে সে সেই সকল স্তরে পর্যন্ত উন্নীত হতে পেরেছে যা আল্লাহ্‌র বন্ধুগণের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত। এবং সে সেই ঐশী সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভে ভরপুর হয়েছে, যার দ্বারা ভরপুর হয়েছিলেন সেই সব কামেল ঈমানদার ব্যক্তিগণ যাঁরা অতীত হয়ে গেছেন। এবং এ শুধু কথার কথাই নয়, বরং বাস্তবেও ঐ সমস্ত ভালবাসার এক স্বচ্ছ প্রস্রবণ সে তার পরিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রবহমান দেখতে পায়। এবং সে তার প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্কের এমন এক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে যা না কোন ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব, না কোন দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান সম্ভব। সে তার আত্মার উপরে ঐশী আলো বা আনওয়ারে ইলাহীর ধারাসমূহ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে দেখে। এবং ঐ সমস্ত আলোর প্রতিফলন ঘটে তার উপরে কখনও ভবিষ্যতের গায়েবী সংবাদ দানের মাধ্যমে, কখনও জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম তত্ত্বোপলব্ধির আকারে, আর কখনও কখনও বা উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশিত করার মাধ্যমে। কোরআন মজীদের কার্যকারিতার এই সকল প্রবাহ

করে তোলে। বসন্তকালের আগমনে যেমন উদ্ভিদ জগতে জীবনের সাড়া পড়ে যায়, তেমনি তাঁদের আগমনেও বিনম্র প্রকৃতির মধ্যেও স্বভাবের আলো স্ফুরিত হয়। এবং আপনাআপনি প্রতিটি ভাগ্যবান হৃদয় এটাই কামনা করে যে, সে তার সৌভাগ্যের যোগ্যতাসমূহকে বিকশিত করে তোলার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সে অলসতার পর্দা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে; এবং পাপ ও অপবিত্রতার কলঙ্ক থেকে এবং অজ্ঞতা ও অসতর্কতার অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। তাঁদের মুবারক সময়কালের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, এমন কিছু আলোর প্রভা ছড়িয়ে পড়তে থাকে যে, তখন প্রত্যেক মুমিন ও প্রত্যেক সত্যান্বেষী ব্যক্তি নিজেদের ঈমানী শক্তির অনুপাতে নিজের নিজের নফসের মধ্যে প্রকাশ্য কোন কারণ ছাড়াই, এক প্রকার প্রসারতা ও ধর্মপরায়ণতার আগ্রহ অনুভব করে, এবং হিম্মতের মধ্যে বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চারিত হওয়া উপলব্ধি করে। সংক্ষেপে, তাঁদের সেই সুমিষ্ট আঘ্রাণ, যা তাঁরা আহরণ করেছেন তাঁদের পূর্ণ অনুবর্তিতার কল্যাণে তা থেকে প্রত্যেক মুখলেস নিষ্ঠাবান ব্যক্তি তার আন্তরিকতার অনুপাতে লাভবান হয়। অবশ্য, যারা চিরজীবন হতভাগ্য তারা এথেকে কোনভাবেই লাভবান হতে পারে না। বরং তারা আরও বেশী শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও দুর্ভাগ্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাবিয়া জাহান্নামে পতিত হয়। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন : خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

(আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের হৃদয়গুলির উপরে) -২ ঃ ৮।

(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ. ৫০৬-৫১০, উপ-পাদটীকা)

(২৯)

'কোরআন শরীফের অনুসারীগণ যে সকল নেয়ামত লাভ করে থাকেন এবং যেসকল বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, যদিও তা সবই বর্ণনা ও বক্তৃতার বহির্ভূত বিষয়, তবু সেগুলির মধ্যে এমন কিছু উচ্চস্তরের নেয়ামত আছে যেগুলির কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করা এখানে এজন্যই প্রয়োজন বোধ করছি যে, এতে করে অনুসন্ধানকারীরা হেদায়াত লাভ করতে পারবে। নিম্নে সেই বর্ণনা প্রদত্ত হলো :

এগুলির মধ্যে রয়েছে জ্ঞান ও সূক্ষ্ম তত্ত্বোপলব্ধি বা মারেফত, যা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন পূর্ণ বা কামেল অনুসারীগণ নেয়ামতে ফুরকানিয়ার ট্রে বা পাত্র থেকে। মানুষ যখন কোরআনে মজীদের প্রকৃত অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়ে যায় এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এর আদেশ ও নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে এবং একনিষ্ঠ ভালবাসা ও আন্তরিকতাসহ এর হেদায়াত বা নির্দেশাবলীর উপরে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কোন ক্ষেত্রেই নিবৃত্ত না হয়, তখন তার পর্যবেক্ষণ ও মনন-চিন্তনের উপরে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে এক আলো দান করা হয়। এবং তাকে একপ্রকার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি দান করা হয় যার ফলে কালামে ইলাহী বা কোরআন শরীফে নিহিত গুপ্ত ইল্‌মে ইলাহী বা ঐশী জ্ঞানের আশ্চর্য ও বিস্ময়কর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদির রহস্য তার নিকটে উন্মোচিত হয়। এবং তার হৃদয়ের উপরে সূক্ষ্ম ও গভীর মারেফতের জ্ঞান বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হতে থাকে। এ হচ্ছে সেই গভীর ও সূক্ষ্ম মারেফাত যাকে 'হিকমত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে ফুরকানে মজীদে। যেমন, বলা হয়েছে : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

(তিনি যাকে চান হিকমত (Wisdom) দান করেন, এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় ২ ২৭০।

বা সিলসিলা বরাবর জারি রয়েছে। এবং যখন থেকে সত্যতার সূর্য কল্যাণময় সত্তা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন থেকেই আজ পর্যন্ত হাজারো আত্মা, যাঁরা যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখেন তাঁরা কালামে ইলাহী অর্থাৎ কোরআন করীমের অনুবর্তিতায় এবং রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর আনুগত্যের ফলে উল্লিখিত ঐ সমস্ত উন্নত স্তরেই উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এখনও হয়ে চলেছেন। খোদাতায়ালা তাঁদের উপরে এমনভাবে একের পর এক বিরল অনুগ্রহ ও উন্নত মর্যাদা ও ফযিলত দান করতে থাকেন এবং এমনভাবে সমর্থন ও প্রাচুর্য্য প্রকাশিত করতে থাকেন, যাতে করে স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ঐ সমস্ত লোক খোদাতায়ালার কাছে গৃহীত এবং তাঁদের উপরে রয়েছে ঐশী সন্তুষ্টির এক মহীয়ান ছায়া এবং তাঁরা সর্বদা মহিমান্বিত ঐশী কল্যাণে বিভূষিত। এবং অবলোকনকারীরা পরিষ্কার দেখতে পায় যে, তাঁরা অসাধারণ প্রাচুর্যে সম্মানিত, এবং আশ্চর্য ও বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা বা কারামতের অধিকারী। তাঁরা ভালবাসার আতর দ্বারা সিক্ত এবং গৃহীত হওয়ার গরবে গর্বিত। সর্বশক্তিমানের আলো (নূর) তাঁদের সাহচর্যে, তাঁদের একাগ্রচিত্ততায়, তাঁদের সাহসিকতায়, তাঁদের প্রার্থনায়, তাঁদের দৃষ্টিতে, তাদের চারিত্র্যে, তাঁদের জীবন যাত্রায়, তাঁদের সন্তোষে, তাঁদের ক্রোধে, তাঁদের পসন্দে, তাঁদের অপসন্দে, তাঁদের কাজেকর্মে, তাঁদের আরাম-আয়েশে, তাঁদের কথাবার্তায়, তাদের নীরবতায়, তাঁদের জাহিরে, তাঁদের বাতেনে, এমন ভরপুর প্রতীয়মান হয় যে, মনে হয় যেন একটি পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ কাঁচের পাত্র অতিশয় উৎকৃষ্ট আতর দ্বারা পরিপূর্ণ। এবং তাঁদের সাহচর্যের কল্যাণে, মনোনিবেশে এবং ভালবাসায় যা অর্জন করা সম্ভব হয়, তা কঠোরতম অনুশীলনের মাধ্যমেও অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাঁদের সম্পর্কে শুভাকাঙ্খা ও সুধারণা পোষণ করলে ঈমানের অবস্থা এক দ্বিতীয় রঙে রঙিন হয়ে ওঠে এবং সৎ চরিত্র প্রদর্শন করায় এক শক্তির সৃষ্টি হয়ে যায়; এবং প্রবৃত্তির তাড়না ও নফসের অবাধ্যতার প্রবণতা দূরীভূত হতে থাকে। পক্ষান্তরে, প্রশান্তি ও সুখকর অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে। এবং যোগ্যতা ও সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার অনুপাতে ঈমানে উদ্দীপনার সৃষ্টি হতে থাকে, এবং ভালবাসা ও প্রেরণা প্রকাশিত হতে থাকে। আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা স্মরণের আনন্দ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদের সংসর্গে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, তাঁরা তাদের ঈমানের শক্তিসমূহের, চারিত্রিক অবস্থাসমূহের, দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্রচিত্ততায়, মহব্বতে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র সহিত ভালবাসায় এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া-মমতায় এবং কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্টি ও অবিচলতায় এত উঁচু স্তরে উন্নীত যে, পৃথিবীতে তার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। সুস্থ বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করতে পারে যে, সেই বন্ধন ও সেই জিঞ্জীর তাঁদের পা থেকে খসে পড়েছে যার দ্বারা অন্যেরা শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। এবং সেই তঙ্গী ও হতাশা ও সেই সংকীর্ণতা তাঁদের হৃদয় থেকে দূরীভূত করা হয়েছে, যেজন্য অন্যদের হৃদয় সংকুচিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাঁরা খোদাতায়ালার সহিত বারবার কথা বলার এবং খোদা কর্তৃক সম্বোধিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত। তাঁরা অবিরামভাবে এবং স্থায়ীভাবে সম্বোধিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। তাঁরা সত্য ও মহান খোদা এবং তাঁর আগ্রহী বান্দাগণের মধ্যে এরশাদ ও হেদায়াত দানের মধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত হন। তাঁদের নূরানিয়ত বা উজ্বলতা অন্যদের হৃদয়কে আলোকিত

অর্থাৎ, খোদাতায়ালা যাকে চান হিকমত দান করেন, এবং যাকে হিকমত দান করা হয়েছে তাকে কল্যাণের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে। অন্যকথায়, হিকমতকে বলা হয়েছে প্রভূত কল্যাণ। যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করেছে সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। অতএব, এই যে জ্ঞান ও মারেফত বা নিগূঢ় উপলব্ধি যাকে অন্যকথায় বলা হয়েছে হিকমত, তা প্রচুর ও পরিব্যাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এক বিশাল মহাসমুদ্রের ন্যায়, এবং তা-ই দান করা হয় কালামে ইলাহীর অনুসারীবৃন্দকে। এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ও মনন-চিন্তনে এমন এক কল্যাণ বা বরকত দান করা হয়, যার ফলে অতি উচ্চস্তরের সত্যতাসমূহ প্রতিফলিত হতে থাকে তাদের আত্মার স্বচ্ছ আয়নায় এবং তাদের কাছে উন্মোচিত হতে থাকে পূর্ণ ও নির্মল সত্যসমূহ, এবং প্রত্যেক গবেষণা ও অনুসন্ধানের সময়ে ঐশী সাহায্য তাদের জন্য এমন কিছু সামান ও উপায়-উপকরণের বন্দোবস্ত করে থাকে যার বদৌলতে তাদের বয়ান আধাআধি থাকে না, অসমাপ্তও থাকে না; এবং তার মধ্যে না কোন কমতি থাকে, না ত্রুটি। অতএব, যে সমস্ত ইল্‌ম ও মারেফত, সত্যতা ও সূক্ষ্মতত্ত্ব, দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, তা সবই পূর্ণতায় ও বৈশিষ্ট্যে এত উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন হয় যে, তা সাধারণ্যের সম্পূর্ণ অতীত। এবং তার তুলনা দেওয়া বা মোকাবেলা করা অপরাপর লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, ঐগুলি তাদের মনে আপনাআপনি উত্থিত হয় না, বরং গায়েবী উপলব্ধি ও ঐশী সমর্থনের মাধ্যমে তাদের প্রতি আরোপিত হয় এবং সেই উপলব্ধির জোরে ঐ সমস্ত কোরআনী রহস্যাবলী ও আলোকসমূহ তাদের উপরে প্রকাশিত হয়। যা শুধু আকল্ বা যুক্তির (Reason) কুয়াশা ঢাকা আলোর সাহায্যে আহরণ করা সম্ভব নয়। এবং এই সমস্ত ইল্‌ম ও মারেফত, যা তাদেরকে দান করা হয়, তারই মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী এবং পরকালের জগৎ সম্পর্কিত গভীর সূক্ষ্ম বিষয়াদির গূঢ় হকীকত তাদের নিকট উন্মোচিত হয়। এ এক প্রকার রূহানী বিস্ময়, যা জ্ঞানীজনের দৃষ্টিতে বস্তুজগতের বিস্ময়ের অধিক ও সূক্ষ্মতর। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যাবে যে, আরেফীন ও আহ্‌লুল্লাহ্‌গণের (প্রত্যক্ষদর্শী ও আল্লাহ্‌র প্রিয়জনদের) মান-মর্যাদা, জ্ঞানী ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে, ঐ সমস্ত বিস্ময়-এর দ্বারাই অনুধাবন করা সম্ভব। এবং সেই যে বিস্ময়, তা-ই তাদের উচ্চ অবস্থানের অলংকার ও সাজ-সজ্জা, তাদের ললিত চেহারার রূপ ও সৌন্দর্য। কেননা, মানব-প্রকৃতির মধ্যে এটা নিহিত যে, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও প্রকৃত মারেফতের ভয়মিশ্রিত-বিস্ময় তার উপরে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করে, এবং তার কাছে সবচাইতে প্রিয় বিষয় হচ্ছে সত্যতা ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান–সাদাকাত ও মারেফত।

যদি কোন সন্ন্যাসী কিংবা আবেদ বা ইবাদতগুযার ব্যক্তি সম্পর্কে এটা ধারণা করা হয় যে, সে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ সাহেবে মোকাশেফাত এবং সে অদৃশ্যের বা গায়েবের খবরাদিও প্রাপ্ত হয় বলে মনে হয়, এবং সে কঠোর অনুশীলন ব্রতও পালন করে থাকে, এবং কখনও কখনও এক প্রকারের অসাধারণ ক্রিয়াকলাপও তার দ্বারা প্রকাশিত হয় ; কিন্তু সে ঐশীজ্ঞান বা ইল্‌মে ইলাহীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এমনকি, সে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যও সৃষ্টি করতে পারে না, বরং বিভ্রান্তিকর চিন্তা-চেতনার মধ্যে গ্রেফতার ও ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যে নিপতিত এবং সে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্বল ও প্রতিটি বিষয়ে ভুলের

শিকারে পতিত হয়; তাহলেই এই রকম ব্যক্তি, সুস্থ বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে হেয় ও ঘৃণার্হ বলেই প্রতীয়মান হবে। এর কারণ এটাই যে, যদি কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন বুদ্ধিমান মানুষ অজ্ঞতার দুর্গন্ধ পায় এবং তার মুখ থেকে আহাম্মকীপূর্ণ কথাবার্তাও শুনতে পায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তির প্রতি তার মন বিরূপ হয়ে যায়। তখন ঐ ব্যক্তি জ্ঞানের দৃষ্টিতে সম্মানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। তা সে যত বড় সন্ন্যাসী আর এবাদতকারীই হোক না কেন, সে হেয়রূপেই গণ্য হবে। সুতরাং, মানুষের ঐ স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিক বিস্ময় অর্থাৎ জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও মারেফত বা নিগূঢ় তত্ত্বোজ্ঞান হচ্ছে আহ্‌লুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র লোকদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মীয় বিস্ময় বা অলৌকিকতাকে সনাক্ত করার জন্য বিশেষ চিহ্ন বা খাস আলামত এবং সেটাই জরুরী। অতএব, এই সমস্ত আলামতই পূর্ণরূপে ও উত্তমরূপে দান করা হয় ফুরকানে শরীফের কামেল আনুগত্যকারীদেরকে। যদিও তাঁদের অনেকেই তেমন শিক্ষিত হন না এবং প্রচলিত বা আধুনিক বিষয়াদি সম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞান রাখেন না। কিন্তু তাঁরা সুক্ষ্মজ্ঞান, গূঢ় তত্ত্বোপলব্ধি ও ঐশী ভিত্তিক জ্ঞান বা ইল্‌মে ইলাহীর ক্ষেত্রে তাঁদের সমসাময়িক সকলের চাইতে এত বেশী উন্নত ও অগ্রসর থাকেন যে, প্রায় সময় তাঁদের বড় বড় বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁদের বক্তৃতা শুনে এবং তাঁদের রচনাদি পাঠ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং স্বতস্ফূর্তরূপে বলে ওঠেন, ওঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মারেফত অন্য এক জগতের এবং তা সবই ঐশী সমর্থনের বিশেষ রঙে রঞ্জিত। এর আর একটি প্রমাণ হচ্ছে, যদি কোন বিরুদ্ধবাদী ঐশী বিষয়াদি সম্পর্কিত তাঁদের কোন বক্তব্যের প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে তাঁদের কোন সত্যগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার সঙ্গে তার কোন বক্তৃতার তুলনা করে, তাহলে অবশেষে, তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, অবশ্য যদি সে সুবিচার ও সততা রক্ষা করে, প্রকৃত সত্যতা নিহিত ঐ সমস্ত বক্তৃতার মধ্যেই যা কিনা নিঃসৃত হয়েছে তাঁদের মুখ থেকে। এবং আলোচনা যত বেশী গভীর হতে থাকবে তত বেশী সুক্ষ্ম এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ তা থেকে বেরিয়ে আসতে থাকবে, যার ফলে তাঁদের সত্য হওয়াটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হতে থাকবে। বস্তুতঃ তাঁদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রত্যেক সত্যান্বেষীর কাছে আমরা নিজেরাই প্রস্তুত রয়েছি। এই সব নেয়ামতরাজির মধ্যে একটি হচ্ছে পাপশূন্যতা, যাকে ব্যাখা করা যায় ঐশী হেফাযত বলে। এই পাপশূন্যতা ফুরকানে মজীদের পূর্ণ আনুগত্যকারীদেরকে প্রদত্ত হয় অনন্য সাধারণ এক দান রূপে। এক্ষেত্রে, পাপশূন্যতা বলতে আমরা বলতে চাচ্ছি যে, তাঁদেরকে সর্বপ্রকার অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা, চারিত্র্য এবং কাজকর্ম থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়, যার মধ্যে অন্যদেরকে দিনরাত লিপ্ত ও জড়িত থাকতে দেখা যায়। যদি তাঁদের ক্ষেত্রে কখনও কোন বিচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হয়, তখন ঐশী কৃপা বা রহমতে ইলাহী অতি দ্রুত তাদের তদারকী করে (অর্থাৎ তাদের অবস্থান ঠিক করে দেয়)।

এতো জানা কথাই যে, পাপশূন্যতার মোকাম অত্যন্ত নাজুক, এবং তা নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মার তাড়না থেকে সম্পূর্ণ দূরে অবস্থিত। এবং এই মোকাম অর্জন

করা বিশেষ ঐশী মনোযোগ ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, সাধারণ কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, সে যেন মিথ্যা তথা মিথ্যাচারিতার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলে তার সকল কাজে-কর্মে কথাবার্তায়, তার বৃত্তিতে পেশায়;তাহলে এটা তার পক্ষে কঠিন, এমন কি, অসম্ভব হয়ে পড়বে। বরং এটা করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টাও যদি সে চালায়, তাহলে সে এত সব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে পড়বে যে, পরিশেষে, সে এটাকেই একটা নীতিরূপে গ্রহণ করে বসবে যে, দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে মিথ্যা ও প্রতারণা পরিহার করে চলা সম্ভবই না।

কিন্তু, ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য, যারা সত্যিকারের ভালবাসা এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফুরকানে মজীদের হেদায়াত অনুসরণ করে চলতে চায়, তাদের জন্য শুধু এটাই সহজসাধ্য করা হয় না যে, তারা মিথ্যাচারিতার জঘন্য অভ্যাস বর্জন করে চলবে, বরং তারা প্রত্যেক প্রকারের অনুচিত ও অকথ্য (অর্থাৎ অবাঞ্ছিত) বিষয়াদি পরিহার করে চলার ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমানের তরফ থেকে সামর্থ্য লাভ করবে। খোদাতায়ালা স্বীয় সর্বোত্তম রহমতের কল্যাণে তাদেরকে সেই সর্বপ্রকার অশুভের প্রভাব ও আকর্ষণ থেকে রক্ষা করে যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। কেননা, তারাই হচ্ছে পৃথিবীর আলো-নূর। এবং তাদের নিরাপত্তার মধ্যেই নিহিত পৃথিবীর নিরাপত্তা এবং তাদের ধ্বংস হওয়ার অর্থই পৃথিবীর ধ্বংস হওয়া। এ কারণেই, তাদেরকে সুরক্ষিত রাখা হয় প্রত্যেক প্রকারের ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, চিন্তা-ভাবনা, ক্রোধ ও আবেগ, ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, সংকীর্ণতা ও প্রচুরতা, খুশী ও দুঃখ-বেদনা, অভাব ও স্বচ্ছলতার ক্ষেত্রে এবং অযৌক্তিক কথাবার্তা ও অপবিত্র চিন্তা-চেতনা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অবৈধ কার্যকলাপ অসঙ্গত বুদ্ধি-বিবেচনা এবং অহং-এর বাড়াবাড়ি প্রভৃতি থেকেও তাদেরকে রক্ষা করা হয়। তারা অবাঞ্ছিত কোন ব্যাপারেই আঁকড়ে থাকে না। কেননা, স্বয়ং খোদাওন্দ করীম তাদের তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাদের পবিত্র বৃক্ষের যে ডালটিকে শুকনো দেখতে পান, সেটাকে তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের মুরব্বীয়ানা হাতেই কেটে ফেলে দেন। ঐশী সাহায্য সর্বদাই সর্বক্ষেত্রে তাদের তত্ত্বাবধান করে থাকে। এই যে হেফাযতের নেয়ামত তা কোন অপ্রমাণিত ব্যাপার নয়। বরং যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদের সাহচর্যে এলে এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে।

এতদ্ব্যতীত আর একটি নেয়ামত হলো আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীলতা বা তাওয়াক্কুল-এর মোকাম। এই মোকামে বা অবস্থানে তাদেরকে অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারা ছাড়া অন্যেরা এই স্বচ্ছ প্রস্রবণ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু তাদের জন্য একে মধুর ও সুস্বাদু করা হয়। মারেফতের আলো তাদেরকে এমনভাবে সহায়তা দিতে থাকে যে, প্রায় সময় তারা নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হয়েও এবং নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্বল অবস্থায় দেখতে পেয়েও এরূপ প্রফুল্লচিত্ততার সঙ্গে জীবনযাপন করে এবং এরূপ সন্তোষের সঙ্গে দিনাতিপাত করে যে, দেখে মনে হয় যেন তাদের কাছে অজস্র ধন-সম্পদের ভান্ডার মজুদ রয়েছে। তাদের চেহারায় প্রাচুর্যের লালিত্য পরিদৃষ্ট হয় এবং বিত্তশালীর অবিচল ভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা অভাব-অনটনের অবস্থায় সুপ্রসন্ন চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে নিজেদের দয়াময় প্রভুর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল থাকে। তারা কোরবানী ও আত্মত্যাগের পথে নিজেদেরকে নিবেদিন করে। সৃষ্টির সেবা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। তাদের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্যের লেশমাত্র থাকে না, এমনকি যদি সারা জগৎ তাদের পরিবারভুক্ত হয়ে

যায়, তবুও না। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, খোদাতায়ালার সাত্তারিয়ত বা আচ্ছাদনক্ষমতা, যে জন্য সবারই কৃতজ্ঞচিত্ত থাকা উচিত, তা সর্বক্ষেত্রেই তাদের জন্য পর্দাপুশি করে থাকে, আব্রু-আবরণ দিয়ে থাকে। কোন দুঃসহ বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ঐশী হেফাযতের আঁচল তলে আশ্রয় দান করা হয়। কেননা, তাদের সকল অবস্থায় অভিভাবক হন খোদাতায়ালা। যেমন তিনি স্বয়ং বলেছেন : وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

এবং তিনিই সৎকর্মশীলদেরকে রক্ষা করেন। *(৭ঃ১৯৭)*। কিন্তু অন্যান্যদেরকে দুনিয়াদারীর নিষ্ঠুর পরীক্ষার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং সেই যে অনন্য সাধারণ আচরণ, যা কেবল তাদের সঙ্গে করা হয়, তা অন্যদের সঙ্গে করা হয় না। এবং তাদের এই বৈশিষ্ট্যেরও প্রমাণ তাদের সাহচর্যে এলে অতি সহজেই পাওয়া যায়।

অতঃপর আর একটি নেয়ামত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সহিত ব্যক্তিগত ভালবাসা বা মহব্বতে জাতি-এর মোকাম। এই মোকাম বা অবস্থানেও কোরআন শরীফের পূর্ণ আনুগত্যকারীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাদের শিরা-উপশিরায় মহব্বতে ইলাহীয়া বা আল্লাহ্‌তায়ালার ভালবাসা এমনভাবে ক্রিয়াশীল করা হয় যে,তা তাদের সত্তার হকীকত বরং তাদের প্রাণের প্রাণ বনে যায়, তাদের হৃদয়ে মাহবুবে হকীকি বা প্রকৃত ভালবাসার পাত্রের প্রতি এক প্রকার আশ্চর্য প্রেম উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এবং এক প্রকার এমন অনন্য সাধারণ মমত্ব ও আগ্রহ তাদের বিশুদ্ধ চিত্তে অধিকার বিস্তার করে যা অন্য সমস্ত কিছু থেকেই তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে; এবং ঐশী-প্রেম বা ইশ্‌কে ইলাহীর অগ্নি এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে যে, তা সঙ্গী-সাথীদের কাছেও বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয়, অনুভূত হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত প্রেমিকরা তাদের প্রেমের আবেগ ও প্রকাশকে কোন বাহানা বা কোন প্রকার চেষ্টা-চরিত্রের দ্বারা গোপন রাখতে চাইলেও তা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। যেমন,পার্থিব কোন প্রেমিকের পক্ষেও এটা সম্ভব হয় না যে, সে তার ভালবাসার পাত্র যাকে দেখার জন্য দিন রাত সে মরে আর কি, তার প্রতি ভালবাসাকে নিজের বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের কাছে গোপন করে রাখে। তেমনি সেই যে প্রেম, যা কিনা তাদের কথা-বার্তায়, তাদের চেহারা-সুরতে, তাদের চোখে-মুখে, চালে-চলনে এবং তাদের স্বভাবে মিশে যায়, এবং তাদের প্রতিটি পশম থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে, তাকে তারা কোনমতেই অপ্রকাশিত রাখতে পারে না। গোপন রাখার হাজার চেষ্টা করলেও তার কোনও না কোনও চিহ্ন প্রকাশ হয়ে পড়েই। এবং তাদের আন্তরিকতার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ এটাই যে, তারা তাদের ভালবাসার পাত্রকে অন্য সমস্ত কিছু থেকেই একেবারে একান্ত করে নেয়। এবং যদি কোন প্রকার দুঃখ-বেদনা তাঁর পক্ষ থেকে আপতিত হয়, তাহলে তাকে ঐকান্তিক ভালবাসার কারণে পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করে। এবং শাস্তিকে মনে করে সুমিষ্ট শরবত। কোন শাণিত তরবারিও তাদেরকে তাদের প্রিয়তম থেকে বিচ্ছন্ন করতে পারে না। কোন ভীষণ দুর্যোগও তাদেরকে সেই প্রিয়পাত্রের স্মরণ থেকে কভু বিস্মৃত করতে পারে না। তাঁর স্মরণকেই তারা মনে করে নিজেদের প্রাণ। তাঁর ভালবাসার মধ্যেই লাভ করে তৃপ্ত আনন্দ। তাঁর অস্তিত্বকেই মনে করে(নিজেদের) অস্তিত্ব। এবং তাঁর স্মরণকেই মনে করে

জীবনের উদ্দেশ্য। যদি চাইতে হয় তো তাঁকেই চায়। যদি আরাম পায় তো তাঁর মধ্যেই পায়। সারা জগতে তাদের আছেন কেবল তিনিই এবং তারাও শুধু তাঁরই তরে। তাঁরই জন্যে বাঁচে। তাঁরই জন্যে মরে। দুনিয়াতে থেকেও তারা দুনিয়া-ছাড়া। অহম্ থাকা সত্ত্বেও তারা অহম্-শূন্য। তাদের না সম্মানের কোন তোয়াক্কা আছে না নামের, না নিজের প্রাণের, না আরামের। বরং, সব কিছুকেই এক জনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে। এবং একজনকে পাওয়ার জন্যই সব কিছু উৎসর্গ করেছে তারা এক অদৃশ্য অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে চলেছে, অথচ বলতে পারে না, কেন তারা দগ্ধীভূত হচ্ছে। তারা বুঝ-সুজ বা আদেশ-উপদেশের প্রতি বোবা ও বধির। তারা প্রত্যেক দুঃখ-মুসিবত ও প্রত্যেক অবমাননা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত থাকে এবং তার মধ্যেই আনন্দ পেয়ে থাকে।

আর একটি নেয়ামত হচ্ছে, **উন্নত নৈতিক গুণাবলী**। যেমন, দানশীলতা, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, দৃঢ় হিম্মত, দয়াশীলতা, বিনয়, লজ্জা, বন্ধু-বাৎসল্য ইত্যাদি, এ সমস্ত গুণাবলীই তাদের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টরূপে ও উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এবং তারা কোরআন শরীফের আনুগত্য করার কল্যাণে কৃতজ্ঞতার সাথে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিটি অবস্থায় প্রতিটি গুণ সুন্দরভাবে সুষ্ঠুরূপে বিকশিত করতে থাকে। কোন বাধা-বিপত্তি তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না, তাদেরকে তাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য প্রকাশিত করা থেকে প্রতিহত করতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, মানুষের জ্ঞানের অথবা কর্মের অথবা চরিত্রের যা কিছু সৌন্দর্য প্রকাশিত হতে পারে, তা শুধু মানবীয় শক্তিতেই প্রকাশিত হতে পারে না। বরং, তার প্রকাশের মূল কারণ হচ্ছে ঐশী কৃপা বা ফযলে ইলাহী। অতএব, এই সকল ব্যক্তি যেহেতু ঐশী কৃপার জন্য সব চাইতে যোগ্য বলে বিবেচিত, সেহেতু খোদ খোদাওন্দ করীম আপনার সীমাহীন কৃপা ও অনুগ্রহরাজি দ্বারা তাদেরকে বিভূষিত করে থাকেন। অন্য কথায় এটাও বুঝতে পার যে, খোদাতায়ালা ছাড়া আর কেউই নেক বা উত্তম নয়; সমস্ত উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী এবং সমস্ত নেকী (বা সৎকর্ম) তাঁর মধ্যেই সন্নিবেশিত। সুতরাং, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে তার নিজের নফ্স ও ইচ্ছা-অভিলাষকে লয় করে দিয়ে সেই সর্বশুভ সত্তার সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে সেই ব্যক্তির নফ্সের উপরে সেই পরিমাণে ঐশী চারিত্রিক গুণাবলী বা আখলাকে ইলাহীয়া প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। অতএব, বান্দা যে সমস্ত সৌন্দর্য ও সত্য সংস্কৃতি অর্জন করে থাকে তা সাকল্যই অর্জিত হয় তার খোদাতায়ালার নৈকট্যের কল্যাণে। এবং এমনটি হওয়াই উচিত ছিল। কেননা, সৃষ্টি তো তার অস্তিত্বের দিক থেকে কিছুই না। সুতরাং, ঐশী উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিফলন কেবল তাদেরই হৃদয়ের উপরে হয়ে থাকে যারা কোরআন শরীফের পূর্ণ অনুবর্তিতায় আত্মনিয়োগ করে। খাঁটি অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, যে বিশুদ্ধ আচরণ, যে রূহানী আগ্রহ ও ভালবাসাপূর্ণ আবেগের মাধ্যমে তাদের উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রকাশিত হয় তার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, যদিও মুখে তার দাবী প্রত্যেকেই করতে পারে। এবং প্রত্যেকেই বড়াই করে যা খুশী বলতে পারে। কিন্তু খাঁটি অভিজ্ঞতার দরজা তো সংকীর্ণ, এবং সেই সংকীর্ণ দরজা দিয়ে সহি-সালামতে সুস্থভাবে বেরিয়ে আসতে পারে

কেবল ঐ সমস্ত লোকেরাই। অন্যান্য লোকেরা কিছুটা উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী দেখাতে পারলেও তা অতিকষ্টে এবং লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে দেখাতে পারে। এবং তারা নিজেদের কলুষতাকে ঢেকে রেখে নিজেদের ব্যাধিসমূহকে লুকিয়ে রেখে নিজেদের নকল কৃষ্টি বা তাহ্‌যীবকে জাহির করে থাকে। ফলে, ছোট-খাটো কোন পরীক্ষায় পড়লেও তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। তারা কষ্ট করে এবং লোক-দেখানোর জন্যে উৎকৃষ্ট নৈতিকতা প্রদর্শন এজন্যই করে থাকে যে, তারা এর মধ্যেই দেখতে পায় তাদের দুনিয়াদারী ও আরাম-আয়েশের উত্তম উপায়। আর যদি তারা প্রতি ক্ষেত্রেই তাদের অভ্যন্তরীণ কলুষতার অনুসরণ করে চলে, তাহলে তাদের জীবনযাপন প্রণালীতে গড়বড় দেখা দিবে। আর যদি, সহজাত বা স্বভাবজ যোগ্যতার অনুপাতে কোন নৈতিকতার বীজ তাদের ভেতরে থেকেও থাকে তবে তা-ও তাদের প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার কাঁটার তলে উপ্ত থাকে। তাদের সেই নৈতিকতা প্রবৃত্তির তাড়নার কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য প্রকাশিত হয় না, এমনকি তা (সেই নৈত্তিক গুণ) পূর্ণতায় পৌঁছে গেলেও না। স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্যই এই বীজ কেবল তাদেরই ভেতরে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে, যারা শুধু খোদারই হয়ে যায়। তখন খোদাতায়ালা তাদের নফ্‌সকে অন্য সব কিছুর কামনা থেকে শূন্য দেখতে পেয়ে স্বয়ং আপনার পবিত্র চারিত্র্য দিয়ে তা ভরপূর করে দেন। এবং তাদের হৃদয়ে এই চারিত্র্যকে এমন প্রিয় করে দেন, যেমন প্রিয় তারা তাঁর কাছে। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলীন বা ফানা হয়ে যাওয়ার কারণে, **'তাখাল্লুক বি আখ্‌লাকিল্লাহ্‌'** -আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়ার এমন মর্তবা বা স্তরে উন্নীত হয় যে, তারা খোদাতায়ালার এক প্রকার যন্ত্র হয়ে যায়, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর গুণাবলী প্রকাশিত করেন। এবং তিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত ও পিসাসার্ত দেখতে পেয়ে, স্বয়ং তাঁর বিশেষ ঝরণা থেকে পবিত্র পানি পান করান, যার মহান উৎসের মধ্যে কোন সৃষ্টির কোন অংশীদারিত্ব নেই।

এই সমস্ত মহান নেয়ামত ছাড়াও, এক কামালে আযীম অর্থাৎ অতি মহৎ উৎকর্ষতা ও পরিপূর্ণতা কোরআন শরীফের পূর্ণ ও একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে দান করা হয়, এবং তা হচ্ছে **'উবুদিয়্যত'** বা সম্পূর্ণ দাসত্ব (অন্য কথায় খোদাতায়ালার নিকটে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ)। অর্থাৎ অনেক উৎকর্ষতা বা কামালাত অর্জন করা সত্ত্বেও তারা সর্বদাই নিজেদের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং সর্বশক্তিমান বারীতায়ালার সম্মুখে হামেশাই বিনম্র এবং নাস্তি এবং বিনীত অবস্থায় থাকে। এবং নিজেদের প্রকৃত বাস্তবতা বা আসল হাকীকতকে হেয় এবং দরিদ্র এবং নিঃস্ব এবং ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা বলে মনে করে। এবং তাদেরকে প্রদত্ত সমস্ত কামালতকেই মনে করে সেই অস্থায়ী আলোকের ন্যায় যা কোন সময় সূর্যের তরফ থেকে দেওয়ালের উপরে পতিত হয়, যার সঙ্গে দেওয়ালের কোন প্রকৃত সম্পর্ক নেই; এবং যা চেয়ে আনা পোষাকের মতই ওয়াপোষযোগ্য। অতএব; তারা সমস্ত কল্যাণ ও ঔৎকর্ষকে খোদার মধ্যেই সন্নিবদ্ধ বলে জানে। এবং তামাম নেকী বা পুণ্যকর্মের প্রস্রবণের উৎস-মুখ জানে সেই পূর্ণ ও পবিত্র সত্তাকেই। ঐশী গুণাবলী বা সিফাতে ইলাহীয়া-কে প্রত্যক্ষ করার দরুন তাদের হৃদয় এই হাক্কুল ইয়াকীন বা সুনিশ্চিত বিশ্বাসে পূর্ণ হয় যে, তারা কিছুই না। এমনকি, তারা

তাদের অস্তিত্ব এবং ইচ্ছা-অভিলাষ থেকে সাকল্যেই হারিয়ে যায়। এবং আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বা আযমতে ইলাহীর পূর্ণ জোশ ও আবেগের সাগর তাদের হৃদয়গুলিতে এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠে যে, তারা হাজারো ধরনের নাস্তির অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং **'শির্‌কে খফী' বা সুক্ষ্ম বা গুপ্ত অংশীবাদিতার** প্রত্যেক শিরা উপশিরা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত হয়ে যায়। উল্লিখিত নেয়ামতসমূহ ছাড়াও (পবিত্র কোরআনের পূর্ণ আনুগত্যকারীগণকে) আর একটি মহান নেয়ামত দান করা হয় এবং তা হচ্ছে, তাদেরকে মারেফত ও খোদাকে চেনার ও জানার জ্ঞানে ভূষিত করা হয়। এবং তা করা হয় তাদেরকে সত্য **কাশ্‌ফ্‌** (দিব্যদৃষ্টি), **ইল্‌মে লাদুন্নী** (বর্ধিত গূঢ় জ্ঞান), সুস্পষ্ট **ইল্‌হাম** (ঐশীবাণী), খোদার সঙ্গে কথাবার্তা এবং খোদা কর্তৃক সম্বোধিত হওয়া, এবং অতিপ্রাকৃতিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অতি উত্তমরূপে ও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে। এমন কি যে, তখন তাদের এবং পর-জগতের মধ্যে বাকী থাকে মাত্র একটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাফ পর্দা যার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত করে তারা ইহ-জগতে থেকেই পর জীবনের ঘটনাবলী দেখতে পায়। অন্যান্য লোকেরা কোনক্রমেই এই উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে না। কারণ, তাদের কেতাবগুলো অন্ধকারে ভরা। বরং, তাদের বিকৃত শিক্ষার গ্রন্থগুলো তাদের নিজেদের পর্দাগুলোর উপরে আরও শত শত পর্দা ফেলে দিয়ে ঢেকে দেয় এবং ব্যাধিকে বৃদ্ধি করতে করতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এবং ফিলোসফী, যার অনুসরণ করছে আজকাল ব্রাহ্ম সমাজীরা, যাদের পূরো ধর্মমতটাই কেবল যুক্তির উপরে নির্ভরশীল, তারা নিজেদের পথে নিজেরাই ব্যর্থকাম হয়েছে এবং তাদের ব্যর্থতার প্রমাণস্বরূপ এটাই যথেষ্ট যে, তাদের মারেফত, শত শত ভ্রান্তির কারণে আপাতঃ গ্রাহ্য যুক্তি এবং সংশয়কে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারে না। এবং এটাতো জানা কথাই যে, যার উপলব্ধি মাত্র আপাতদৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তা-ও আবার নানা প্রকারে ত্রুটিযুক্ত, তার বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান তো ঐ ব্যক্তির তুলনায় (যার ইরফান বা তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধতার স্তরে উন্নীত) অত্যন্ত নিম্ন স্তরের এবং তা পতনশীলও। প্রকাশ থাকে যে, দর্শন ও চিন্তন-এর স্তরের বাইরেও স্বতঃসিদ্ধি ও স্বতঃপ্রমাণের এক স্তর রয়েছে। যে বিষয়টি দর্শন অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তন দ্বারা বুঝা সম্ভব তা অন্য কোন উপায়েও বুঝা সম্ভব এবং এতে করে তা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রমাণিত হয়েই যায়। সুতরাং, স্বতঃসিদ্ধতার যে স্তর, তার যথার্থতা যুক্তির প্রেক্ষিতেও সম্ভব। যদিও বাহ্মসমাজীরা বাহ্যতঃ এই স্তরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তবু তারা একথা অস্বীকার করে না যে, যদি বাহ্যতঃ ঐ স্তরকে পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে উন্নত এবং উত্তম। এবং দর্শন ও চিন্তনের পর্যায়ে যে সমস্ত কমতি অবশিষ্ট থেকে যায় তা সবই এই পর্যায়ে পূরণ করা সম্ভব হয় প্রকাশিতরূপে, সুপ্রতিষ্ঠিতরূপে। আর এই কথাটা কে না বুঝতে পারে যে, কোন একটা বিষয়ের সুস্পষ্টরূপে উদ্‌ঘাটিত হওয়াটা (সেই বিষয়কে) শুধু বাহ্যদৃষ্টিতে অবলোকন করার চাইতে অনেক বেশী উন্নত ও পূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সৃষ্টিকে দেখার পর যে কোন বুদ্ধিমান ও সৎপ্রকৃতির মানুষের চিন্তা এই দিকে ধাবিত হয় যে, এর কোন এক স্রষ্টা থাকাই উচিত। কিন্তু, ঐশী উপলব্ধি বা মারেফতে ইলাহীর স্বতঃপ্রকাশিত ও আলোকিত জ্ঞান, যা কিনা তাঁর অস্তিত্বের শক্তিশালী প্রমাণ, তা হচ্ছে, তাঁর বান্দারা ইল্‌হাম বা ঐশীবাণী পেয়ে থাকে, বস্তুনিচয়ের প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হওয়ার পূর্বেই সে সম্পর্কে তাদেরকে

অবহিত করা হয়। এবং তারা খোদাতায়ালার কাছ থেকে তাদের প্রার্থনার জবাব পায়। খোদার সাথে তাদের কথাবার্তা হয় এবং তারা খোদা কর্তৃক সম্বোধিত হয়। এবং কাশ্‌ফ্‌ বা দিব্য-দৃষ্টিতে তাদেরকে পর জগতের ঘটনাবলী দেখানো হয়। এবং পুরস্কার ও শাস্তির প্রকৃত অবস্থা বা হকীকত তাদেরকে অবহিত করা হয়। এবং পরকালের বিভিন্ন প্রকারের রহস্য তাদের প্রতি উন্মোচিত করা হয়। কোন সন্দেহ নেই যে, এই সকল বিষয়াদি দৃঢ় বিশ্বাস বা ইলমুল ইয়াকীনকে উত্তম ও পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করে। এবং চিন্তন-এর নিম্ন স্তরসমূহ থেকে উন্নীত করে স্বতঃসিদ্ধতার উচ্চ মিনারার শীর্ষে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। খোদাতায়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং খোদা কর্তৃক সম্বোধিত হওয়াই (মুকালামাত ও মুখাতাবাত) হচ্ছে এ সমস্ত কিছুর মধ্যে, বিশেষ করে, উন্নত পর্যায়ের। কেননা, এর মাধ্যমে কেবল গায়েবী খবরাদি বা গুপ্ত বিষয়াদি সম্পর্কেই জ্ঞাত হওয়া যায় না, এবং বিনয়ী বান্দার প্রতি মওলা করীম আল্লাহ্‌তায়ালার যে দানসমূহ, সে সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে সুমিষ্ট ও মঙ্গলময় বার্তার দ্বারা তাকে (বান্দাকে) এরূপ সন্তোষ ও প্রশান্তি দান করা হয় এবং খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়, যার ফলে সে পার্থিব সকল অশুভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য বিপুল শক্তি লাভ করে। মনে হয় যেন ধৈর্য ও অবিচলতার পাহাড় তাকে দান করা হয়েছে।

এইভাবে, বাণীর মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান ও মারেফত বা গূঢ় উপলব্ধি বান্দাকে দান করা হয়। এবং এমন সব গোপন রহস্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়, যা বিশেষ ঐশী শিক্ষা বা খাস রব্বানী তালীম ছাড়া জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। আর যদি কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে যে, এই সকল বিষয়াদি যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তা কোরআন শরীফের পূর্ণ আনুগত্যকারীরা লাভ করে থাকে, তা কীভাবে ইসলামের মধ্যে বাস্তবে কার্যকর বলে প্রমাণিত,সাব্যস্ত হতে পারে। তাহলে, এই ধারণার জবাব হচ্ছে তা হতে পারে সোহবত বা সঙ্গলাভের দ্বারা। যদিও আমরা বহুবার বলে এসেছি, তবু কথা না বাড়িয়ে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে আর একবার বলে দিতে চাই যে, এই মহাসম্পদ সত্যিসত্যিই ইসলামে পাওয়া যায়, অন্য আর কোন ধর্মেই পাওয়া যায় না। সত্যান্বেষীর কাছে এর প্রমাণ দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। তবে, শর্ত এই যে, সেই ব্যক্তিকে আমাদের সাহচর্যে থাকতে হবে এবং সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সত্যান্বেষণে ব্রতী হতে হবে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে। তাহলেই, এই সকল বিষয়াদি উদ্‌ঘাটিত হতে পারবে তার কাছে, তার ক্ষমতা ও যোগ্যতার অনুপাতে।'

(বারাহীনে আহ্‌মদ ীয়া, পৃ. ৫১০-৫২৩, উপ-পাদটীকা-৩)

(৩০)

'কোরআন শরীফ, যার উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য, তা এমন একটি গ্রন্থ যার অনুসরণে ইহজগতেই পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়। এই যে একমাত্র গ্রন্থ যা জাহেরী ও বাতেনী বা প্রকাশ্য ও গোপন উভয় পন্থাতেই ক্ষতিগ্রস্ত আত্মাগুলিকে পরিশুদ্ধ করে এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্তি দান করে। এর যে প্রকাশ্য পদ্ধতি বা জাহেরী তরিকা তার বর্ণনা এত বেশী ব্যাপক যে, তার মধ্যে যাবতীয় সত্যতা ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে যত সব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে আছে বা সৃষ্টি হয়, যা খোদা পর্যন্ত পৌঁছাতে বাধা দান করে, যার মধ্যে পতিত

হয়ে শত শত মিথ্যা ফের্কা বা দলের উৎপাত ঘটছে, এবং শত শত প্রকারের মিথ্যা মতবাদ বিপথগামী বা গোমরাহ্ লোকদের হৃদয়গুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, সে সমস্ত কিছুরই খণ্ডন যৌক্তিকরূপে ও যথার্থরূপে বিদ্যমান রয়েছে এই গ্রন্থের মধ্যে। এবং যে সব সত্য, সঠিক ও পূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার আলো বর্তমান যামানার অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য প্রয়োজন, তা সবই সূর্য্যের ন্যায় এর মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করছে। এবং এর মধ্যে সকল প্রকারের আধ্যাত্মিক ব্যাধির নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এবং এই গ্রন্থ সমস্ত মারেফতে হাক্কা অর্থাৎ প্রকৃত নিগূঢ়-জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ। এমন কোন সূক্ষ্ম ঐশী জ্ঞান বা ইলমে ইলাহী নেই যা ভবিষ্যতে কোন সময়ে প্রকাশিত হতে পারে, তা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। বাতেনী তরীকা বা গোপন পন্থা হচ্ছে এই যে, এর পূর্ণ অনুসরণ হৃদয়কে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করে দেয় যে, মানুষ আভ্যন্তরীণ সমস্ত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং তখন কবুলিয়্যতের আলো (খোদা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার আলো) তার উপরে পতিত হওয়া শুরু হয়ে যায়। তখন ঐশী কৃপারাজি তাকে এমনভাবে ঘেরাও করে রাখে যে, দুঃখ-কষ্টের সময়ে সে দোয়া করলে পূর্ণ রহমত ও দয়া সহকারে খোদাওন্দ করীম তার দোয়ার জবাব দিয়ে থাকেন। অনেক সময় এমনও হয় যে, যদি সে তার দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনায় ও বিপদ-আপদে পতিত অবস্থায় হাজার বার প্রার্থনা করে তাহলে সে তার দয়াময় প্রভুর কাছ থেকে হাজার বারই মমতাভরা জবাব পায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট ও কল্যাণময় ভাষায়। এবং তার উপরে ঐশীবাণী বা ইলহামে ইলাহী বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হতে থাকে। সে তার হৃদয়কে ঐশী ভালবাসায় এমন ভরপুর দেখতে পায় যে, যেন তা অতীব মূল্যবান আতর দিয়ে ভরা এক স্বচ্ছ কাঁচের বোতল। তাকে প্রেম ও আবেগের এরূপ পবিত্র এক আনন্দ দান করা হয় যা কিনা তার অহম্-এর কঠিন কঠিন সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে তাকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আনে এবং তাকে মাহবুবে হকীকি অর্থাৎ প্রকৃত প্রেমিক বন্ধুর সুশীতল ও প্রাণ জুড়ানো হাওয়ায় প্রতিক্ষণ প্রতি অবস্থায় নতুন জীবন দান করে। অতএব, সে তার মৃত্যুর পূর্বেই ঐ সমস্ত ঐশী অনুগ্রহরাজিকে স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন করে, যা মৃত্যুর পরে দেখার জন্য আশা রাখে অন্যান্য লোকেরা। এবং এই সকল নেয়ামত কোন সন্ন্যাসব্রত পালনের ও অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা সবই দান করা হয় কোরআন শরীফের আনুগত্যের কারণে। এবং তা প্রত্যেক সত্যান্বেষী ব্যক্তিই পেতে পারে। তবে হ্যাঁ, এ সব পাওয়ার জন্য একটা শর্ত আছে এবং তা হচ্ছে, হযরত খাতামুর রুসুল ও ফখরুর রুসুল সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা। আল্লাহ্র নবী (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার ফলশ্রুতিতে মানুষ ঐ সব আলো থেকে আপন যোগ্যতা অনুসারে তার অংশ পেয়ে থাকে,যা পরিপূর্ণরূপে দান করা হয়েছে আল্লাহ্র নবী (সাঃ)-কে।

অতএব, সত্যান্বেষীর জন্য এর চাইতে উৎকৃষ্ট আর কোন পথ নেই; সে যেন কোন অন্তর্দৃষ্টি ও মারেফত বা গূঢ় তত্ত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে এই নিখাদ ধর্মে প্রবেশ করে এবং কালামে ইলাহী বা কোরআন করীমের অনুবর্তিতা ও রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর ভালবাসা অবলম্বন করে আমাদের এই সকল বর্ণনার সত্যতা স্বচক্ষে দর্শন করে। যদি সে তার এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মল চিত্তে আমাদের কাছে আসে, তাহলে আমরা খোদাতায়ালার কৃপা ও করুণার উপরে ভরসা করে আনুগত্যের সেই পথ বাত্লিয়ে

দিতে প্রস্তুত আছি। তবে, প্রয়োজন খোদাতায়ালার কৃপার, এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ্যতারও। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, **প্রকৃত নাজাত বা পরিত্রাণ** হচ্ছে উত্তম স্বাস্থ্যের ন্যায়। সুন্দর স্বাস্থ্য যেমন তাকেই বলা হয় যার মধ্যে সুস্বাস্থ্যের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট থাকে, এবং স্বাস্থ্যহীনতারও কোনও লক্ষণ থাকে না; ঠিক তেমনি, প্রকৃত নাজাতও তা-ই যার মধ্যে নাজাতের চিহ্নসমূহের প্রভাব বা কার্যকারিতা পরিস্ফুট থাকে। কেননা, যে জিনিসের অস্তিত্ব সঠিকরূপে প্রমাণিত হয়, তার সেই প্রমাণিত অস্তিত্বের পক্ষে সঠিক কার্যকারিতা ও চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হওয়াও প্রয়োজন। নইলে, ঐ জিনিসের কার্যকারিতা ও আলামতের অভাবে তার অস্তিত্ব সঠিকরূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। আমরা যেমন বার বার বলে এসেছি যে, পরিত্রাণের নিশ্চিত প্রমাণ বা তাহ্‌কীকে নাজাত-এর জন্য বিশেষ যে আলামতের প্রয়োজন তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দিকে কেটে পড়া (ইনকেতা ইলাল্লাহ্) এবং আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমের প্রাধান্য থাকা। এবং তা (সেই অবস্থা) এমন এক পূর্ণতার স্তরে পৌছে যাবে যে, তখন তা সেই (নাজাত প্রাপ্ত) ব্যক্তির সাহচর্য এবং মনোনিবেশ এবং প্রার্থনার মাধ্যমে অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারবে। সে স্বয়ং তার ব্যক্তিগত সেই অবস্থায় এরূপ আলোকিত অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন হবে যে, তার আশিস বা বরকত সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে স্বতঃপ্রকাশিতরূপে পরিদৃষ্ট হবে। এবং তার মধ্যে সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যাবে, এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সম্বোধিত হওয়ার সেই সম্মানেও সে ভূষিত হবে, যা কিনা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের জন্য নির্ধারিত। এক্ষেত্রে, কেউ যেন জ্যোতিষী ও গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা ধোঁকা না খায়। এবং একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আহ্‌লুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র লোকদের আলোক ও আশিস-কল্যাণের সঙ্গে ঐ শ্রেণীর লোকগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

আমরা ইতোপূর্বে লিখেছি যে, শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী এবং কৃপাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, যা প্রকৃতই সত্য এবং যার মধ্যে আগাগোড়াই বিজয় ও সাহায্যের শুভ-সংবাদ এবং সৌভাগ্য ও সম্মানের খোশ-খবর নিহিত থাকে, তার সঙ্গে মানবীয় কলা-কৌশলের কোনপ্রকার সম্পর্ক নেই। যারা আহ্‌লুল্লাহ্ হয়ে যান তাঁদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা এমন প্রকৃতি দান করেন যে, তাঁদের দৃষ্টি এবং সাহচর্য এবং মনোনিবেশ বা তাওয়াজ্জহ্ এবং প্রার্থনা বা দোয়া পরম কল্যাণপ্রসূ হয়ে থাকে, তবে শর্ত হচ্ছে, কল্যাণ গ্রহীতার গ্রহণ ক্ষমতা থাকতে হবে। এবং এই সকল ব্যক্তিরা শুধু যে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের দ্বারাই সনাক্ত হয়ে থাকেন তা নয়, বরং তাঁরা তাদের মারেফত বা গভীর উপলব্ধির ভাণ্ডার, তাঁদের অনন্য সাধারণ আস্থা বা তাওয়াক্কুল, তাঁদের পরিপূর্ণ ভালবাসা, তাঁদের (দুনিয়া থেকে) সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা, তাঁদের অবিচলতা, তাঁদের ঐশী প্রেম, তাঁদের আগ্রহ ও আনন্দ, তাঁদের চরম বিনয়, তাঁদের আত্মার পবিত্রতা, তাঁদের পার্থিব আসক্তি পরিত্যাগ, তাঁদের অজস্র কল্যাণ যা বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়, তাঁদের আল্লাহ্‌র সমর্থন লাভ, তাঁদের তুলনাহীন দৃঢ়তা, তাঁদের উন্নত স্তরের কৃতজ্ঞতা, তাঁদের অতুল তাকওয়া বা খোদাভীরুতা, তাঁদের পবিত্রতা, তাঁদের সুদৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতা বা হিম্মত, তাঁদের হৃদয়ের প্রসারতা, প্রভৃতি দ্বারাও সনাক্ত হয়ে থাকেন। এবং ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য এটাই যে, যাতে করে তাঁরা সেই সকল বরকত যা তাঁদের উপরে এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তদের উপরে

বর্ষিত হবে সে ব্যাপারে পূর্বেই বলে দিয়ে তাদের সেই বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে পারে যে, তাঁরাই হচ্ছে খোদাতায়ালার বিশেষ মনোযোগের পাত্র। এছাড়া যে সমস্ত সম্বোধন ও কথাবার্তা বা যোগাযোগ তাঁদের হয় খোদাতায়ালা সঙ্গে, তা তাঁদের সত্য হওয়ার এবং খোদাতায়ালার তরফ থেকে হওয়ার এক অকাট্য এবং নিশ্চিত প্রমাণ। এবং সেই সমস্ত মানুষ যাঁদের উপরে এই সব পবিত্র বরকত বা কল্যাণ বিপুল পরিমাণে দান করা হয়, তাঁদের ব্যাপারে খোদাতায়ালার কুদরত বা ক্ষমতা এবং চিরন্তন হিকমত বা প্রজ্ঞার কানুনে এটাই নির্ধারিত যে, তাঁরা সবাই হবেন এমন মানুষ যে, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস বা আকায়েদ হবে সত্য এবং পবিত্র, তারা সত্যধর্মের উপরে স্থাপিত ও অবিচলরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, খোদাতায়ালার সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ হবে অতি উচ্চ পর্যায়ের এবং তাঁরা দুনিয়া ও দুনিয়াদারীর যাবতীয় সম্পর্ক থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখবেন। এই সমস্ত মানুষ পরশপাথরের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। তাঁদের প্রকৃতি ঐশী আলোক ও সত্য ধর্মের প্রতি ধাবিত। তাঁদের সত্তা প্রশংসার যোগ্য এবং তা যাবতীয় কল্যাণরাজিতে বিভূষিত। তাঁদের সঙ্গে দুর্ভাগা গণকঠাকুর ও জ্যোতিষীদের তুলনা করাটা চূড়ান্ত আহাম্মকী এবং নিতান্ত বদনসীবী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, তাঁরা দুনিয়ার ঘৃণার্হ অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক রাখেন না। বরং তাঁরা সূর্যের ও চন্দ্রের ন্যায় আসমানী নূর-আলো। এবং ঐশী প্রজ্ঞার চিরন্তন কানুন এই উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছে যে, তাঁরা যেন দুনিয়াতে এসে দুনিয়াকে আলোকিত করেন। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, খোদাতায়ালা যেমন শারীরিক রোগ-ব্যাধির জন্য বিভিন্ন ঔষধ সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রতিষেধকরূপে নানান ভাল ভাল জিনিষ সৃষ্টি করেছেন, যা পৃথিবীতে মজুদ রয়েছে। সব ব্যথা-বেদনা, রোগ-বালাই নিরাময়ের জন্য; এবং সমস্ত ঔষধ পত্রের মধ্যে আদিকাল থেকেই এই গুণ রেখে দিয়েছেন যে, যদি কোন রোগী, যদি তার রোগ নিরাময়ের বাইরে গিয়ে না থাকে, সেই সমস্ত ঔষধ নিয়ম মত ব্যবহার করে, তাহলে সেই পরম নিরাময়কারীর এই ব্যবস্থাও জারি রয়েছে যে, সেই রোগীকে তার যোগ্যতা ও ক্ষমতার অনুপাতে সুস্থতা ও শক্তি দান করা হবে, কিংবা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থতা দান করা হবে। একইভাবে, খোদাওন্দ করীম এই সকল নৈকট্যপ্রাপ্তগণের পবিত্র আত্মার মধ্যে আদিকাল থেকেই এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তাঁদের মনোনিবেশ, দোয়া এবং সাহচর্য এবং দৃঢ় সংকল্প যোগ্যতা অনুসারে, আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের নিরাময়কারী ঔষধ। এবং তাঁদের আত্মা আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে বাণীবার্তা সম্বোধন ও কাশ্‌ফ বা দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে নানা প্রকার ফয়েয বা আশিস লাভ করে থাকে। এবং ঐ সমস্ত আশিস আল্লাহ্‌র সৃষ্টির হেদায়াতের ক্ষেত্রে এক অতি মহৎ কার্যকারিতা প্রদর্শন করে থাকে। সংক্ষেপে, আহ্‌লুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র প্রিয় লোকেদের সত্তা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির জন্য এক রহমতস্বরূপ। এবং যেভাবে, কার্য-কারণ প্রণালীতে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী যে ব্যক্তি পানি পান করে সে পিপাসার কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পায়, যে রুটি খায় সে ক্ষুধার কষ্ট থেকে মুক্তি পায়, ঠিক সেইভাবে এই ঐশী নিয়মও জারি রয়েছে যে, আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি দূর করার জন্য আম্বিয়া এবং তাঁদের পূর্ণ অনুগতদেরকে মাধ্যমে ও উসিলারূপে নির্ধারিত করা হয়েছে। তাঁদেরই সাহচর্যে হৃদয় শান্তি লাভ করে। মানবীয় দুর্বলতাসমূহ দূর হয়। এবং অহম বা খুদী-এর অন্ধকার অপসৃত হয়। এবং আল্লাহ্‌র প্রেমের আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং

আসমানী বরকতসমূহ প্রকাশিত হয় এবং এই সমস্ত কিছু তাঁদেরকে বাদ দিয়ে লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব, এগুলোই হচ্ছে সেই সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে তাঁদেরকে সনাক্ত করা যায়।' *(বারহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ.৩২৩-৩৩৪, উপ-হাশিয়া ২)*

(৩১)

'এখন আমরা এখানে সাধারণভাবে উপকারের জন্যে রীতি মোতাবেক বর্ণনা করছি যে, কোন একটি কালাম'এর (বাণী বক্তৃতা বা রচনার) কি এমন বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, যে বৈশিষ্ট্যের কারণে সেই কালাম এইরূপ প্রশংসিত হতে পারে যে, তা তুলনাবিহীন এবং খোদার তরফ থেকে। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোরআন শরীফের যে কোন একটি সূরা উদ্ধৃত করে, তা থেকে প্রমাণ করে দেখাব যে, রীতি মোতাবেক (অন্তরাঙ্গিক ও বহিরাঙ্গিক) যে সকল গুণাবলীকে অতুলনীয় ও অনবদ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়, তা সবই এর মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণরূপেই এবং সর্বোত্তমরূপেই। অতঃপর, যদি কেউ এই সকল অতুল ও অনিন্দ্য গুণাবলীকে অস্বীকার করে তাহলে এটা প্রমাণিত করার জন্য জিম্মাদার তাকেই হতে হবে এবং সে অপর কোন একটি কালাম পেশ করে দেখাবে যে, তার মধ্যেও ঐ অতুল ও অনবদ্য গুণাবলী সবই বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং, এটা সুস্পষ্ট যে, যদি কোন কালাম সেই সমস্ত বিষয়েই, যা কিনা খোদাতায়ালার তরফ থেকে আগত এবং তারই শক্তি বা কুদরতের হস্ত দ্বারা নির্মিত অন্য কোন জিনিসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রাখে অর্থাৎ তার মধ্যে যদি ঠিক সেভাবেই প্রকাশ্য ও গোপন (জাহেরী ও বাতেনী) বিস্ময়সমূহ বিদ্যমান থাকে, যেভাবে তা বিদ্যমান থাকে খোদাতায়ালার নির্মীত কোন জিনিসের মধ্যে, তাহলেই কেবল সেই অবস্থায় বলা যাবে যে, ঐ কালাম এমন এক স্তরে অধিষ্ঠিত যে, তার কোন উপমা সৃষ্টি করতে মানবীয় শক্তি অপারগ। কেননা, যে জিনিস অতুলনীয় বা বেনযীর তা যে খোদার পক্ষ থেকে আগত, তা সাধারণ ও অসাধারণ সকলের কাছেই গ্রহণীয় ও স্বীকৃত এবং এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত বা আপত্তি থাকে না। এবং ঐ জিনিষের সমস্ত গুণাবলীতে যদি অপর কোন জিনিষেরও পুরোপুরি অংশীদারিত্ব থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত হবে যে, এই জিনিষটিও অতুলনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন একটা জিনিষ অপর একটা জিনিষের মাপের সমান হয়, এবং এই জিনিষটার মাপ যদি হয় দশ গজ, তাহলে সেই (প্রথম) জিনিষটা সম্পর্কে নিশ্চিতরূপেই প্রমাণিত হবে যে, সেটিও মাপে দশ গজ।

এখন আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সৃষ্টি থেকে একটি নাজুক সৃষ্টিকে যেমন ধরুন, গোলাপ ফুলকে গ্রহণ করবো, এবং এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সেই সব বিস্ময় (wonders) এর বর্ণনা দান করবো, যার দরুন এর উন্নত অবস্থা সম্পর্কে স্বীকার করা হয় যে, অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টি করা মানবীয় শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি, এটাও প্রমাণ করে দেখাব যে, ঐ সমস্ত বিস্ময়ের তুলনায় সূরা ফাতিহা-এর বিস্ময় ও ঔৎকর্ষ বা কামালাত পরস্পর সমান বরং অধিকতর। এবং এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরার পেছনে কারণ হচ্ছে, একবার এই অধম তার কাশ্‌ফী দৃষ্টিতে দেখলো যে, সূরা ফাতিহা একটি পাতার উপরে লিখিত এবং তা রয়েছে এই অধমের হাতে। এবং তা এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় যে, যে কাগজের উপরে সূরা ফাতিহা লেখা রয়েছে তা যেন এত অধিক সংখ্যক কোমল

লাল গোলাপের ফুল দিয়ে ভরপুর যে, তার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। এবং যখন এই আযেয (বিনীত) সূরাটির কোন একটি আয়াত তেলাওয়াত করছিল তখন তার মধ্য থেকে বহু সংখ্যক গোলাপের ফুল অতি সুমিষ্ট আওয়াজের সঙ্গে পাপড়ি মেলে মেলে উপরের দিকে উড়ে উড়ে উঠছিল। এবং ফুলগুলি ছিল খুবই কোমল, বড় বড়, সুন্দর, তাজা ও ঘ্রাণময়। এবং এগুলির উপরে উড়ে উঠার সময় মন ও মস্তিস্ক ঘ্রাণে ঘ্রাণে ভরে উঠেছিল, এবং এমন এক অভিভূত অবস্থার সৃষ্টি করছিল যা তার অনুপম আকর্ষণের দ্বারা দুনিয়া ও দুনিয়াস্থ সব কিছুর প্রতি দারুণ এক ঘৃণার সৃষ্টি করছিল। এই কাশ্‌ফ থেকে উপলব্ধি করেছিলাম যে, সূরা ফাতিহার সঙ্গে গোলাপ ফুলের একপ্রকার আধ্যাত্মিক বা রূহানী সম্পর্ক রয়েছে। এবং এই সম্পর্কের কারণেই এই দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। এবং এটাই যথার্থ মনে করা হয়েছে যে, প্রথমতঃ উপমাস্বরূপ গোলাপ ফুলের সব বিস্ময়কে যা এর প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়, তার বিবরণ দেওয়া দরকার। অতঃপর এর বিস্ময়গুলির তুলনায় সূরা ফাতিহার জাহেরী ও বাতেনী সমস্ত বিস্ময় (wonders)-এর বর্ণনা করা উচিত; যাতে করে সুধী পাঠক উপলব্ধি করতে পারেন যে, বহুবিধ যে গুণাবলী ও সৌন্দর্য জাহেরী ও বাতেনীভাবে গোলাপ ফুলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তার জন্যই এর উপমা দেওয়াটা যথার্থ মনে করা হয়েছে। অবশ্য একই ধরনের হলেও এর চাইতে অধিক উন্নত গুণাবলী ও সৌন্দর্য বিদ্যমান রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে। আর এই উপমাটি দেওয়া হচ্ছে এজন্যই যে, এতে করে আমাকে প্রদত্ত কাশ্‌ফী ইঙ্গিত-এর উপরেও আমল করা হবে।

অতএব, জেনে রাখা দরকার যে, এই বিষয়টি প্রত্যেক আকল বা সুস্থবুদ্ধির নিরিখে কোন প্রকার দুর্বোধ্যতা ছাড়াই, স্বতঃপ্রমাণিত যে, গোলাপ ফুলও আল্লাহ্‌তায়ালার অন্য সব সৃষ্টির মতই এমন সব উৎকৃষ্ট গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারণ করে যার সদৃশ কোনও কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা মানুষের নেই। এবং এই সমস্ত গুণাবলী বা সৌন্দর্য দু'প্রকারের। এক–যা এর প্রকাশিত চেহারায় দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ এর রঙ যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সুন্দর। এর ঘ্রাণ যা খুবই মধুর ও হৃদয় প্রশান্তকারী। এবং এর শরীরও অতিশয় কোমল, পেলব, তাজা, নাজুক ও পরিষ্কার। দ্বিতীয় প্রকারের গুণাবলী হচ্ছে সেই সমস্ত গুণাবলী, যা এর অভ্যন্তরে সৃষ্টি করেছেন সর্বজ্ঞ খোদাতায়ালা। অর্থাৎ এর সেই সমস্ত গুণাবলী যা কিনা গুপ্ত বা পুশিদা রয়েছে এর সারাংশের মধ্যে। এবং তা হচ্ছে এ হৃদয়কে আনন্দিত করে, শক্তিশালী করে। এ সকল কর্মক্ষমতা ও চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সক্রিয় করে। এ পাকস্থলী, লিভার, কিডনী এবং রক্তবাহী শিরা-উপশিরা, গর্ভাশয় ও ফুসফুসকে শক্তিশালী করে। এ কমা বা অজ্ঞান অবস্থায় এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার খুব উপকারী। এছাড়া আরও বহুবিধ শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ে উপকারী। অতএব, এই উভয় প্রকারের গুণাবলীর কারণে এর সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, এই ফুল এমন সব পরিপূর্ণ গুণসম্পন্ন যে, এর মত কোন ফুল সৃষ্টি করা মানুষের নিজের পক্ষ থেকে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। (সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে কিছুতেই) এমন কোন ফুল বানানো যা রঙে রূপে, সৌন্দর্যে সুঘ্রাণে, হৃদয়ে শান্তি প্রদানে অনুরূপ হবে। এবং দৈহিকভাবে, অনুরূপ সজীব ও সতেজ, নরম ও নাজুক ও পরিষ্কার হবে। এছাড়া অভ্যন্তরীণভাবেও সেই সমস্ত গুণাবলীসম্পন্ন হবে যা সবই পাওয়া যায় গোলাপ ফুলের মধ্যে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, গোলাপ ফুল সম্পর্কে এই বিশ্বাস কেন পোষণ করা

হচ্ছে যে, মানবীয় শক্তি এর কোন নযীর বানাতে অক্ষম? এবং কেনই বা এটা মনে করা ঠিক নয় যে, মানুষ এর নযীর বানাতে সক্ষম? এবং যে সমস্ত প্রকাশ্য ও গুপ্ত গুণাবলী এর মধ্যে পাওয়া যায় তা সবই ঐ বানানো ফুলের মধ্যেও সৃষ্টি করা সম্ভব? তাহলে, এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, এই ধরনের ফুল বানানো বাস্তবেই অসম্ভব। আজও অব্দি কোন চিকিৎসক বা কোন দার্শনিক কোন প্রণালীতে এমন কোন মিশ্রণ বা কম্পাউন্ড তৈরী করতে পারেন নি (বা কোন ফর্মূলা দিতে পারেন নি) যা প্রয়োগ করার মাধ্যমে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে কোন গোলাপ ফুলের আকৃতি ও চরিত্র বা গুণাবলী সৃষ্টি হতে পারে।

এখন এটা উপলব্ধি করা উচিত যে, এটাই সেই কারণ, যেজন্য সূরা ফাতিহার কোন তুলনা নেই। বরং কোরআন শরীফের প্রতিটি অংশই, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, এমনকি তা যদি চার আয়াতেরও কম হয়, তবু তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না। প্রথমে যদি এর বাহ্যিক চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে, এর বর্ণাঢ্য বাকভঙ্গী ও স্টাইল, এর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা, এর শব্দচয়ন, শব্দবিন্যাস এর বাণীর অনবদ্যতা, এক কথায় এর সামগ্রিক রচনাশৈলী এক চরম উৎকর্ষতার জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করছে। এ এমন এক জ্যোতির কিচ্ছুরণ যার অধিক আর কল্পনা করা যায় না। এ অশ্লীল ও অহেতুক বা বাহুল্য শব্দাবলী ও অশুদ্ধ বাক্যগঠন থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ও মুক্ত। এর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বাক্য অতীব প্রাঞ্জল ও সাবলীল । এর প্রতিটি শব্দগুচ্ছ প্রতিটি বাক্যাংশ যথার্থরূপে ও যথাযথরূপে অভিব্যক্ত। এবং রচনারীতির প্রত্যেক প্রকারের স্টাইল, যা রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং বর্ণনাকে সাবলীল করে, তা সবই এর মধ্যে বিদ্যমান। বাগ্মিতার সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য যতটা প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট বর্ণনার ধারণা সর্বোত্তম পর্যায়ে করা সম্ভব তা সবই এর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বর্তমান রয়েছে, প্রকাশিত রয়েছে। এবং অর্থকে পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী করার যতটা সহজ-সুন্দরভাবে বর্ণনা করা দরকার তা-ও সবই এর মধ্যে বিশদরূপে মজুদ রয়েছে। এইরূপ অর্থপূর্ণ বাগ্মিতা ও বর্ণনার সৌন্দর্যের তাবৎ গুণাবলীর পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও এই রচনা সত্য ও সত্যতায় ভরপুর। এমন সামান্য অতিরঞ্জনও এর মধ্যে নেই যাতে করে মিথ্যার কোন লেশ মিশ্রিত হতে পারে। এমন কোন কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনা এতে নেই যার মধ্যে কবিদের রচনার ন্যায় মিথ্যা এবং রঙ্গরস এবং বৃথা দম্ভের ময়লা ও দুর্গন্ধ মিশ্রিত থাকে। অতএব, কবিদের রচনাতো মিথ্যা এবং রঙ্গরস এবং বৃথা দম্ভের দুর্গন্ধে ভরা থাকে, কিন্তু এই রচনা সত্য এবং সত্যতার প্রাণ মাতানো সুগন্ধ দ্বারা ভরপুর। তদুপরি, এই সুঘ্রাণের সাথে এই রচনার আনন্দদায়ক বর্ণনা এবং যথার্থ শব্দ চয়ন এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাকভঙ্গী দ্বারা এমনভাবে রঙ ও রূপে সমৃদ্ধ যে, তা যেন ঠিক সেই গোলাপ ফুল যার সুঘ্রাণের সঙ্গে মিশে আছে তার সুন্দর রঙ ও পরিচ্ছন্নতা। এইতো গেল এর বহিরঙ্গের সৌন্দর্যের কথা। এর, অর্থাৎ সূরা ফাতিহার অন্তরঙ্গের যে গুণাবলী তার দ্বারা বড় বড় সব আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময় হয়ে যায়। এবং এর মধ্যে ইলমী ও আমলী শক্তিকে অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তিকে পূর্ণতা দানের জন্য বহুবিধ সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এই সূরা বড় বড় বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার সংশোধন করে। এবং গভীর মারেফত, অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি –যা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের নযরে পড়ে না –তা সবই এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই সূরা পাঠ করলে সালেক বা সত্যান্বেষীর হৃদয়ে বিশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

এবং তা সন্দেহ-সংশয় ও অজ্ঞতার রোগ থেকে নিরাময় হয়ে ওঠে। বহু উচ্চ স্তরের সত্যতা, অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী যা কিনা আত্মার পূর্ণ বিশুদ্ধতার জন্য প্রয়োজন– তা সবই নিহিত রয়েছে এর মুবারক বা মহৎ বিষয়-বস্তুর মধ্যে। এবং স্পষ্টতঃই এই সমস্ত কামালত বা সৌন্দর্য ও গুণাবলী এমন যে, তা গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য ও গুণাবলীর মতই এমন প্রকৃতিগত বলে মনে হয় যে, তা কোন মানুষের রচনার মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া সম্ভব নয়। এই সম্ভব না হওয়াটা কোন আনুমানিক ব্যাপার নয়, বরং এটা প্রকাশিত। কেননা, সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান ও উচ্চ মারেফত খোদতায়ালা সঠিক প্রয়োজনের সময়ে আপন বাগ্মিতাময় প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে প্রকাশ্য ও গোপন সৌন্দর্যের উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছেন, এবং অতিশয় নাজুক শর্তাবলীসহ প্রকাশ্য ও গোপন-জাহেরী ও বাতেনী-উভয় অবস্থার কামালত ও পূর্ণতাকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ প্রথমতঃ সেই সমস্ত উচ্চ ও জরুরী জ্ঞানের কথা বলেছেন যার প্রভাব ও কার্যকারিতা পূর্ববর্তী শিক্ষাসমূহ থেকে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল এবং কোন চিন্তাবিদ বা দার্শনিকও সেগুলোর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। এগুলোকে আবার অহেতুক ও অনর্থক লিপিবদ্ধ করা হয়নি, বরং ঠিক ঠিক সেই সময় ও সময়ের চাহিদা মোতাবেক বর্ণনা করা হয়েছে, যখন সমসাময়িক যামানার অবস্থার সংশোধন অপরিহার্যরূপে জরুরী হয়ে পড়েছিল। এবং এগুলির বর্ণনা করা না হলে সেই যামানার বিপর্যয় ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠতো। এবং ঐ সমস্ত উচ্চ স্তরের জ্ঞানের কথা গুরুত্বহীনভাবে ও অসম্পূর্ণরূপে লেখা হয়নি, বরং সেগুলিকে যথার্থরূপেই পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। এবং কোন জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান এমন কোনও ধর্মীয় সত্যতা বা দীনি সাদাকাত পেশ করতে পারবে না যা এর বাইরে থেকে গেছে। এবং কোন মিথ্যার পূজারীর এমন কোন সন্দেহ-সংশয় নেই যার অপনোদন এর মধ্যে নেই। এই সমস্ত সত্যতা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রকাশ, যা কিনা অপরদিকে সত্যিকার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার বাগ্মিতা ও সাবলীলতার চরম ঔৎকর্ষ দান করা যার অধিক আর কল্পনা করা যায় না– তা তো অত্যন্ত সুকঠিন কাজ এবং তা স্পষ্টতঃই মানবীয় ক্ষমতা বহির্ভূত। কিন্তু, মানুষ তো এমন অক্ষম বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন যে, নগণ্য বা সাধারণ বিষয়াদিকেও, যা উঁচু স্তরের সত্যতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, তা-ও যদি সে আলংকারিক ও সাবলীল ভাষায় যথাযথরূপে ও সত্যনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করতে চায়, তবে তা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এবং এ কথাটা সব বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছেই সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন দোকানদার একজন উঁচু দরের কবি ও সুলেখক হয়, এবং সে যদি চায় যে, সে তার প্রতিদিনের নানা ধরনের খরিদ্দারদের সঙ্গে উৎকৃষ্ট আলংকারিক ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা বলবে, এবং যদি এ-ও মনে করে যে, এতেই তার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা যথাযথরূপে সম্পন্ন হবে। তাহলে সে তার দোকানদারিতে ব্যর্থ হবে। বরং উচিত হবে, যেখানে কথা কম বলা দরকার সেখানে কম বলবে, যেখানে বেশী বলা দরকার সেখানে বেশী বলবে। ক্রেতার সঙ্গে কোন ব্যাপারে কোন বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে গেলে এমনভাবে কথাবার্তা বলবে যাতে করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, ধরুন একজন বিচারকের কথা, যাঁর কাজ হচ্ছে, বাদী বিবাদী এবং সাক্ষীদের কথা ঠিক ঠিক মত লিপিবদ্ধ করা। প্রত্যেকটি বিবরণ সম্পর্কে যথাযথরূপে ও জরুরীভাবে জেরা করা ও সেগুলির উপরে মন্তব্য রেকর্ড করা, যা কিনা মোকদ্দমার তদন্তের জন্য

শর্তস্বরূপ। এবং মোকদ্দমার বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাদি জানার জন্য অর্থাৎ ইনকোয়ারির জন্য প্রয়োজন মত যথাবিধি সওয়াল-জওয়াব করা এবং তা লিপিবদ্ধ করা। এবং যেখানে যেখানে আইন অনুযায়ী যুক্তি উত্থাপন করা দরকার সেখানে সেখানে নির্ভুলভাবে সেই আইনের উল্লেখ করা। যেখানে পারম্পর্য বা তরতীব অনুযায়ী ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন, সেখানে তা তরতীব অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করা। এবং তাঁর রায়-এর জন্য, এবং সেই রায় দানের যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবই বর্ণনা করা। এই সমস্ত কাজ যদি তিনি এমন এক উন্নত স্তরের বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতাপূর্ণ ভাষায় সম্পাদন করতে চান, যে স্তরের প্রকাশকে অতিক্রম করা অন্য আর কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে তার তাঁর পক্ষেও সম্ভব হবে না। আসলে মানবীয় রচনার অবস্থা তো এই যে, বৃথা অনাবশ্যক ও অনর্থক কথাবার্তা ছাড়া সে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করতে পারে না, এবং মিথ্যা ও অতিরঞ্জন ছাড়া কোন কথাই বলতে পারে না, আর যদি কিছু বলেও, তবে তা-ও আধাআধি, নাক থাকে তো কান থাকে না, কান থাকে তো চোখ নেই, সত্য বলে তো বাগ্মিতা থাকে না, বাগ্মিতা রক্ষা করতে চায় তো মিথ্যা আর আজেবাজে কথার স্তুপের পর স্তুপ জমা করতে থাকে যেন সব একটার পর একটা পেঁয়াজের খোসা, ভেতরে সারবস্তু বলতে কিছুই নেই।

সুতরাং যে অবস্থায় সুস্থ বুদ্ধি এই সিদ্ধান্ত দান করছে যে, সাধারণ ও তুচ্ছ বিষয়াদি এবং সাদাসিদে ঘটনাবলীকেও যখন যথার্থ প্রয়োজনে সত্যিকারভাবে সত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আলংকারিক ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা (মানুষের পক্ষে) সম্ভব হয়ে ওঠে না; তখন এই কথাটা উপলব্ধি করা কতই না সহজসাধ্য যে, উচ্চ মারেফত বা সূক্ষ্মজ্ঞানের কথাকে যথার্থরূপে সত্যিকারভাবে অতিশয় আলংকারিক ও প্রাঞ্জল ভাষায় যার চাইতে উন্নত ও উৎকৃষ্ট আর কল্পনা করা যায় না, তার মাধ্যমে বর্ণনা করাটা সম্পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার এবং তা মানবীয় ক্ষমতা বহির্ভূত। গোলাপ ফুলের মত কোন ফুল, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীসহ তৈরি করা তার পক্ষে সত্যিকার অর্থেই যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব এই বিষয়টিও। কেননা, সামান্য সামান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা যখন এই সাক্ষ্য দেয় এবং সুস্থ স্বভাবও যখন এটা স্বীকার করে যে, মানুষ তার কোন আবশ্যকীয় এবং সত্য ঘটনা, তা সে ঘটনা বেচা-কেনা সম্পর্কিতই হোক আর আদালত ইত্যাদি সম্পর্কিতই হোক সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে চায়, তখন তার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না যে, সে তার সেই কাজ সর্বোত্তম প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় যথার্থরূপে ও যথোপযুক্তরূপে সম্পাদন করে। তাহলে, যে রচনা আবশ্যকতা ও সত্যতা ছাড়াও উচ্চ স্তরের মারেফত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ এবং যথার্থ প্রয়োজনে প্রকাশিত এবং যাবতীয় সত্য ও সত্যতায় ভরপুর; এবং যা সময়োপযোগী সংশোধনে,সত্য প্রতিষ্ঠাকরণে, অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপনে, অস্বীকারকারীদের ত্বরিৎ আপত্তি খণ্ডনে, বা বিতর্কে ও আলোচনায়, আধিপত্য বিস্তারে এবং যাবতীয় জরুরী দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ, জরুরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সওয়াল ও জওয়াব প্রভৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তা কী করে এই সমস্ত দূরূহ বিষয় ও সেগুলির খুঁটিনাটিসহ অনুরূপ প্রাঞ্জলতার ও বাগ্মিতাসহ কোন মানুষের রচনায় সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব? আবার, তার রচনাশৈলীকেও এমন অনবদ্য ও অতুলনীয় হতে হবে যে, তার

চাইতে অধিক উৎকৃষ্ট প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় সেই বিষয়বস্তুকে আর কোনক্রমেই প্রকাশ করা সম্ভব হবে না?

এ তো হচ্ছে সেই সব সত্তা (ও গুণাবলী) যা সূরা ফাতিহা ও কোরআন শরীফের মধ্যে পাওয়া যায়, যেগুলি গোলাপ ফুলের অতুলনীয় গুণাবলীর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সূরা ফাতিহা এবং কোরআন শরীফের মধ্যে আরও একটি বিশেষ গুণ পাওয়া যায় যা কেবল ঐ পবিত্র কালামেরই একক বৈশিষ্ট্য এবং তা হচ্ছে, একে মনোনিবেশ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করলে হৃদয় পবিত্র হয়ে যায়। এবং অন্ধকারের পর্দাসমূহ অপসৃত হয়ে যায়। এবং বক্ষকে সম্প্রসারিত করে। এবং সত্য-সন্ধানীকে খোদাতায়ালার দিকে আকর্ষিত করে তার প্রতি এরূপ আলো ও কার্যকারিতা প্রকাশিত করে যা পরিদৃষ্ট হয় শুধু আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যাক্তিগণের বেলায়, এবং যা অন্য মানুষ অন্য আর কোন উপায়ে বা চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে না। এবং এই আধ্যাত্মিক প্রভাব ও কার্যকারিতার প্রমাণও দিয়েছি আমরা এই পুস্তকে। যদি কেউ সত্যের অনুসন্ধানী হয়, তাহলে এ ব্যাপারে আমরা তাকে নিশ্চিতরূপে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত করতে পারি; তার কাছে নতুন নতুন প্রমাণ পেশ করতেও আমরা সব সময়ে প্রস্তুত আছি। এছাড়া, একথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোরআন শরীফ তার কালামের ক্ষেত্রে অনুপম ও অতুলনীয় হওয়ার ব্যাপারে শুধু যুক্তি-বুদ্ধির প্রমাণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং সুদীর্ঘ সময়ের ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারাও তা প্রমাণিত ও সত্যায়িত। কেননা, কোরআন শরীফ বিগত তেরশ' বছর ধরে তার আপনার সৌন্দর্যাবলীকে তুলে ধরে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে চলেছে এবং সারাটা জগতকে উচ্চৈঃস্বরে বলছে যে, সে তার জাহেরী বা বাহ্যিক চেহারায় এবং বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে অনিন্দ্য ও তুলনাহীন। এবং এ ব্যাপারে কোন জিন্ বা ইনসানের ক্ষমতা নেই যে, তার মোকাবেলা করে বা তার সমকক্ষতা করে। কিন্তু, আজও পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার সাহস পায় নি। এমনকি, অন্ততঃপক্ষে তার কোন একটি সূরা যেমন সূরা ফাতিহারও জাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্যাবলীর মোকাবেলা করতে পারে নি। তাহলে দেখো! এর চাইতে অধিক সুস্পষ্ট এবং অধিক সুপ্রকাশিত মোজেযা বা অলৌকিকত্বের দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? এর মাধ্যমেই যুক্তি-বুদ্ধির ক্ষেত্রেও এই পবিত্র কালামের মানবীয় ক্ষমতা বহির্ভূত হওয়া প্রমাণিত হয়, এবং সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাও এর অলৌকিক গুণাবলীর পক্ষে সাক্ষ্য দান করছে। যদি কারও কাছে এই উভয় প্রকারের প্রমাণ অর্থাৎ বুদ্ধি-আকল ও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হয়, এবং তার নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্পর্কে সে গর্ববোধ করে, অথবা সে যদি এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে যে, দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছে যে কোরআন শরীফের মত অনুরূপ কোন কালাম রচনা করতে সক্ষম হবে, তাহলে আমরা যেমনটা ওয়াদা করেছি যে, সূরা ফাতিহার গূঢ় জ্ঞান ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী সম্পর্কে কিছু নমুনাস্বরূপ লিখব এবং যা লিখেছিও, তারও উচিত যে, সূরা ফাতিহার সেই সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্যাবলীর মোকাবেলায় তার নিজের কিছু কালাম পেশ করা।'

(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃঃ ৩৩২-৩৪। পাদটীকা-১১)

'সূরা ফাতিহার মধ্যে সমস্ত কোরআন শরীফের মতই দু' প্রকারের অতুলনীয় ও অনিন্দ্য সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়। এক, বাহ্যিক বা জাহেরী সৌন্দর্য; আর এক, আভ্যন্তরীণ বা বাতেনী সৌন্দর্য। এর জাহেরী সৌন্দর্য, যে সম্পর্কে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, এর টেক্সট্ বা বয়ান এমন বর্ণাঢ্য ও অনিন্দ্য ,এমন উজ্জ্বল, নাজুক ও সূক্ষ্ম ও কোমল, প্রাঞ্জল ও প্রবহমান ও সুমিষ্ট এবং এর বক্তব্য ও বিন্যাস এত সুন্দর ও সমন্বিত যে, এর অর্থ ও তাৎপর্যকে ধরে রাখার মত এর অনুরূপ বা এর চাইতে উত্তম আর কোন বাগ্মিতাপূর্ণ, সুললিত ও সাবলীল রচনা হওয়াই সম্ভব নয়। যদি সারা দুনিয়ার সকল লেখক কবি ও সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়ে এই প্রচেষ্টা চালায় যে, এই বিষয়বস্তুকে তারা নিজেদের মনের মত করে অপর কোন চমৎকার একটি বর্ণনায় প্রকাশ করবে যা কিনা সূরা ফাতিহার সমকক্ষ হবে কিংবা তার চাইতে উৎকৃষ্ট হবে, তাহলে তারা তাদের এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে, এমন কিছু রচনা তাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না। কেননা বিগত তের শ' বৎসর যাবৎ কোরআন শরীফ সারা পৃথিবীর সামনে তার এইরূপ অতুলনীয় হওয়ার দাবী পেশ করেই আসছে.......। বিরুদ্ধবাদীদের শত শত বৎসরের খামোশী বা নীরবতা এবং তাদের নিরুত্তর বা লা-জওয়াব থাকাটাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, গোলাপ ফুল ইত্যাদির অনুরূপ কোন অতুলনীয়তার প্রমাণ পেশ করাই সম্ভব নয়। কেননা, এই পৃথিবীর কোন চিন্তাবিদ বা কোন শিল্পীকে এছাড়া অন্য আর কোন কিছু সমকক্ষ নির্মাণের জন্য এইভাবে কখনো আহ্বান জানানো হয়নি, এবং তাদেরকে তাদের ব্যর্থতার বা অপারগতার কারণে এই ভীতিও কখনো প্রদর্শন করা হয় নি যে, তাদেরকে এজন্য নানাবিধ শাস্তি ও ধ্বংসের শিকারে পরিণত হতে হবে।............

এক্ষণে আমরা (সূরা ফাতিহার) অভ্যন্তরীণ বা বাতেনী সৌন্দর্যাবলীর উল্লেখ আর একবার করতে চাই, যাতে করে প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিষয়টা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। জানা প্রয়োজন যে, সর্বজ্ঞ খোদাওন্দ করীম মানবদেহের উপকারের জন্য গোলাপের ফুলের মধ্যে নানাবিধ গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যেমন তা হৃদয়কে শক্তিশালী করে, বৃত্তিনিচয়ে এবং আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত করে, বহুবিধ রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে; ঠিক তেমনি খোদাওন্দ করীম সূরা ফাতিহার মধ্যে সমস্ত কোরআন শরীফের মতই, আধ্যাত্মিক বা রূহানী ব্যাধিসমূহের শাফা বা প্রতিকার রেখেছেন। এর মধ্যে বাতেনী বা গোপন ব্যাধিসমূহের সেই সব ঔষধ সঞ্চিত রয়েছে যা অন্য আর কোন কিছুর মধ্যেই নেই। কেননা, এর মধ্যে সেই সমস্ত পারফেক্ট বা কামেল সত্যতা পরিপূর্ণরূপে রয়েছে যা পৃথিবীর বুক থেকে নিচিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং পৃথিবীতে তাঁর কোনও নাম-নিশানাও বাকী ছিল না। ....বস্তুতঃ তা ছিল রহমতের বৃষ্টিধারা যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয়েছিল তৃষ্ণার্তদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য। এবং পৃথিবীর আধ্যাত্মিক জীবন এই অবস্থার উপরেই নির্ভরশীল ছিল যে, ঐ জীবন বারি যেন অবতীর্ণ হয়। এবং তার একটি বিন্দুও এমন ছিল না যার মধ্যে সমসাময়িক রোগ-ব্যাধির ঔষধ ছিল না। এবং তৎকালীন যামানার অবস্থা শত শত বৎসর যাবৎ সার্বজনীনভাবে পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত থেকে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, ঐ সমস্ত

রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা কখনই আপনা-আপনি হয় না, যদি না ঐ আলো অবতীর্ণ হয়। এবং নিজেদের অন্ধকারকেও নিজেরা কখনই অপসারিত করা যায় না, বরং তা সর্বদা এক আসমানী নূর বা স্বর্গীয় আলোর মুখাপেক্ষী যা তার রশ্মিমালার আলোকে পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে, এবং যারা কখনই দেখতে পায় নি তাদেরকে দেখার শক্তি দেয়, যারা কখনই বুঝতে পারে নি তাদেরকে বুঝার শক্তি দেয়। সেই আসমানী নূর দুনিয়াতে এসে শুধু এতটুকুই করেনি যে, তা সেই আবশ্যকীয় প্রকৃত মারেফত বা তত্ত্বজ্ঞান পেশ করেছে যার কোন চিহ্নই ছিল না ভূ-পৃষ্ঠে; বরং তা আপন রূহানী বৈশিষ্ট্যের শক্তিতে ঐ সত্য ও প্রজ্ঞার বা হক্ক্ ও হিকমতের মণিমানিক্য দ্বারা অগণিত বক্ষকে ভরপুর করে দিয়েছে, এবং অগণিত হৃদয়কে সেই প্রাণপ্রিয় সেই দিলরুবা চেহারার প্রতি আকৃষ্ট করেছে, এবং আপন শক্তিশালী প্রভাব ও কার্যকারিতার দ্বারা অসংখ্য ব্যক্তিকে জ্ঞানের ও কর্মের ইল্‌ম ও আমলের উচ্চ স্তরে পর্যন্ত উন্নীত করেছে।

এখন, এই উভয় প্রকারের সৌন্দর্য যা সূরা ফাতিহা এবং সমগ্র কোরআন শরীফের মধ্যে পাওয়া যায়, তা কালামে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র বাণীকে অনুপম ও অনিন্দ্য প্রমাণিত করার স্বপক্ষে এমন উজ্জ্বল দলীল, যেমন গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য;যে সম্পর্কে সকলেই স্বীকার করে যে, তা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে, (অর্থাৎ তার অনুরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা মানবীয় শক্তিতে অসম্ভব)। বরং, সত্য তো এটাই যে, সূরা ফাতিহার ঐ সকল গুণাবলী বা সৌন্দর্য যতটা সুস্পষ্টরূপে অতি-প্রাকৃতিক, ও যতটা মানবীয় শক্তি বহির্ভূত, তার অনুরূপ গুণাবলী বা সৌন্দর্য গোলাপ ফুলের মধ্যে কোনভাবেই পাওয়া যায় না। ঐ সমস্ত গুণাবলীর মাহাত্ম্য এবং মর্যাদা এবং অতুলতা তখনই পরিষ্কার বোধগম্য হয় যখন মানুষ তা বিবেচনা করে একই সঙ্গে একত্রিতরূপে, এবং এ নিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথমতঃ এই বিষয়টাই যদি বিবেচনা করা হয় যে, একটি কালাম বা বাণীর বর্ণনাকে এমন উঁচু স্তরের প্রাঞ্জল, সাবলীল, কোমল, সুমিষ্ট, সহজ আকর্ষণীয় ও বর্ণাঢ্য হতে হবে যে, যদি কোন মানুষ তার নিজের তরফ থেকে অনুরূপ কোন বাণী রচনা করতে চায়, যা কিনা সামগ্রিকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সেই যাবতীয় অর্থ ও তাৎপর্যেও সমৃদ্ধ হবে যা সবই বিদ্যমান রয়েছে সেই প্রজ্ঞাময় বাগ্মিতাপূর্ণ কালামের মধ্যে, তাহলে এটা কিছুতেই সম্ভবই হবে না যে, সেই মানবীয় রচনা বাগ্মিতা ও বর্ণাঢ্যতার সেই উঁচু স্তরে উত্তীর্ণ হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই বিবেচনাও করা হয় যে, সেই রচনার বিষয়-বস্তুকেও এমন হতে হবে যে, তা সেই সত্যতা ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হবে যা সত্যিকার অর্থেই উন্নত স্তরের সত্যতা ও সূক্ষ্মজ্ঞান; এবং তার কোন শব্দগুচ্ছ বা ফ্রেজ, কোন শব্দ, কোন অক্ষরও এমন হবে না যে, তা প্রজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনার অযোগ্য। আবার সেই সঙ্গে এই তৃতীয় বিবেচনাও করতে হবে যে, ঐ সমস্ত সত্যতা বা সাদাকাত এমন হবে যে, তা সবই সমসাময়িক যামানার জন্য অপরিহার্য। আর সেই সঙ্গে এই চতুর্থ বিবেচনাও করতে হবে যে, সেই সমস্ত সাদাকাত, সত্যতা এমন অতুলনীয় ও অনন্য হবে যে, কোন চিন্তাবিদ বা দার্শনিকের পক্ষে তা চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা করে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর এই পঞ্চম

বিবেচনাও করতে হবে যে, যে যুগে এই সমস্ত সাদাকাত প্রকাশিত হয়েছিল তা প্রকাশিত হয়েছিল এক তাজা নেয়ামতস্বরূপ এবং ইতোপূর্বে এই নেয়ামত সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল। অতঃপর, এই ষষ্ঠ বিবেচনাও করতে হবে যে, এই কালামের মধ্যে এমন এক আসমানী বরকত বা স্বর্গীয় কল্যাণ নিহিত থাকতে হবে যে, এর অনুসরণ করলে খোদাওন্দ করীমের সঙ্গে সত্যান্বেষীর এক খাঁটি সম্পর্ক এবং এক গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়, এবং তার মধ্যে সেই আলোকের বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে যা খোদার প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে বিচ্ছুরিত হওয়া উচিত। এই সমস্ত বিষয়কে যখন একত্রে বিবেচনা করা হয়, তখন উপলব্ধি করা যায় যে, সুস্থ বুদ্ধি কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত দান করবে যে, মানবীয় রচনার মধ্যে এই সমস্ত বিষয়াদি সাকল্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় এবং তা আসলেই মানবীয় ক্ষমতার বহির্ভূত বিষয়। এই সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী উৎকর্ষতার প্রতি দৃকপাত করলে বা এ নিয়ে চিন্তা করলে যে-কোন মানুষের মনে সন্দেহাতীতরূপে এক প্রকার ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। এবং তা যে-কোন বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তির মনে এই নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, এই সমস্ত সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতাকে একত্রে আঞ্জাম দেওয়া বা সংমিশ্রিত করা মানবীয় যুক্তি-বুদ্ধি ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। এবং এই ধরনের ভয় ও বিস্ময়পূর্ণ অবস্থা কখনই গোলাপ ফুলের মধ্যে পাওয়া যাবে না। কেননা, কোরআন শরীফ এই অনন্য বিশেষত্ব রাখে যে, এর গুণাবলীর অতুলনীয়তা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে স্বতঃপ্রমাণিত। এবং এ কারণেই যখন এর কোন বিরুদ্ধবাদী লক্ষ্য করে যে, এর একটি অক্ষরও এমনভাবে ব্যবহৃত হয় নি, যা প্রজ্ঞা ও যাথার্থ্য বা হেকমত ও মুসলেহাত বহির্ভূত, এবং তার একটি ফেকরা বা ফ্রেজও এমন নেই যা যামানার সংশোধনের নিমিত্তে অত্যন্ত জরুরী নয়। এবং এর রচনাশৈলী এতো উৎকৃষ্ট যে, এর একটি পংক্তি পরিবর্তন করে তদস্থলে অপর একটি অনুরূপ পংক্তি রচনা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। এইরূপ স্বতঃপ্রকাশিত ঔৎকর্ষকে প্রত্যক্ষ করলে বিরুদ্ধবাদীর হৃদয়েও একপ্রকার বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার হয়। তবে হ্যাঁ, যদি এমন কোন নাদান বা নির্বোধ থাকে যে কখনই এসব বিষয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি, সে যদি তার নির্বুদ্ধিতার কারণে এই প্রশ্ন করে বসে যে, একথার প্রমাণ কি যে, এই সমস্ত গুণাবলী এবং সৌন্দর্য সত্যিসত্যিই সূরা ফাতিহার এবং কোরআন শরীফের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে? তাহলে এটা জানা উচিত যে, একথার প্রমাণ এটাই যে, যারা কোরআন শরীফের অনুপম ঔৎকর্ষ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে তারা ঐ রচনাকে এমন উন্নত স্তরের প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ পেয়েছে যে, তার কোন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে সবাই অক্ষম থেকে গেছে। এবং তার সূক্ষ্ম জ্ঞান ও সত্যতা এমন এক উন্নত স্তরে প্রত্যক্ষ করেছে যে, কোন যুগেই তার কোন নযীর খুঁজে পায়নি। এবং তার মধ্যে সেই আশ্চর্য কার্যকারিতা লক্ষ্য করেছে যা কোনক্রমেই মানবীয় রচনার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। আবার তার মধ্যে এই পবিত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে যা অনর্থক বাগাড়ম্বর করার উদ্দেশ্য অবতীর্ণ হয়নি, বরং তা অবতীর্ণ হয়েছে প্রকৃত প্রয়োজনের তাকিদে। তারা এই সমস্ত কামালত বা ঔৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এর অনুপম মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে

নিয়েছে। এবং তাদের মধ্য থেকে যারা নিদারুণ দুর্ভাগ্যের কারণে ঈমানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদেরও হৃদয়ের উপরে ঐ অনুপম বাণী বা কালামের এমন এক বিস্ময় ও ভীতির প্রভাব পড়েছে যে, তারাও অভিভূত ও বিভ্রান্ত হয়েই বলে উঠেছে যে, এ তো প্রকাশ্য যাদু। এছাড়া সুবিচারক যে কোন ব্যক্তির কাছে কোরআন শরীফের অনবদ্য ও অতুলনীয় হওয়ার এটাও একটা শক্তিশালী দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণ যে, বিগত তেরশ' বছর ধরে কোরআন শরীফ তার বিরুদ্ধবাদীদেরকে কঠিন চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসেছে এবং এর কোনও উত্তর না পেয়ে বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারীদেরকে দুষ্কৃতকারী, অপবিত্র, অভিশপ্ত ও জাহান্নামী বলে আখ্যা দিয়েছে ; কিন্তু তবু বিরুদ্ধবাদীরা কাপুরুষ ও নপুংশকদের ন্যায় নিকৃষ্ট নির্লজ্জতার সঙ্গে এই সমস্ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা অমর্যাদা ও অপমানকে মাথা পেতে নিয়েছে এবং এটাকেই বৈধতা দিয়েছে যে, তাদেরকে মিথ্যুক এবং লাঞ্ছিত এবং নির্লজ্জ এবং দুশ্চরিত্র এবং অপবিত্র এবং দুষ্কৃতকারী এবং বেঈমান ও জাহান্নামী বলাই সঙ্গত। তবু তারা একটা ছোট্ট সূরারও মোকাবেলা করতে পারেনি। তারা খোদার কালামের সমস্ত সৌন্দর্য এবং গুণাবলী এবং মাহাত্ম্য এবং সত্যতা থেকে কোন সামান্যতম ত্রুটিও বের করতে পারেনি। বস্তুতঃ আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের, তাদের অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে কর্তব্য ছিল এবং এখনও রয়েছে যে, যদি তারা তাদের কুফরী বা অবিশ্বাস এবং বেঈমানীকে ছাড়তে না চায়, তাহলে তারা যেন কোরআন শরীফের কোন একটি সূরার অনুরূপ কোন সূরা দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করে। এবং এমন কোন কালাম বা রচনাকে চ্যালেঞ্জস্বরূপ আমাদের সামনে উপস্থিত করে, যার মধ্যে সেই সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্য ও গুণাবলী পাওয়া যাবে যা পবিত্র কোরআনের কোনো ছোট থেকে ছোট সূরার মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে।' *(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ৩৮১–৮৮, পাদটীকা১১)*

(৩৩)

'এখন আমরা প্রমাণস্বরূপ সূরা ফাতিহার কিছু সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং সত্যতা বর্ণনা করবো। কিন্তু, প্রথমে সূরা ফাতিহা লিখে অতঃপর আমরা তার উচ্চ মারেফত বা জ্ঞানের কথা লেখা শুরু করবো।

সূরা আল্ ফাতিহা :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

এই সূরার ভাষ্য বা তফসীর থেকে এর কিছু মারেফত বা সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যতার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হচ্ছে : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

এই আয়াত প্রশংসিত এই সূরার প্রথম আয়াত। এটি কোরআন শরীফের অন্যান্য সূরাগুলির প্রথমে লিখিত হয়েছে। এবং কোরআন শরীফের আরও একটি স্থানে এই আয়াত এসেছে। কাজেই, এই আয়াতের পুনরুল্লেখ যতবার এসেছে কোরআন শরীফে অতটা পুনরুল্লেখ অন্য আর কোন আয়াতের আসেনি। এবং যেহেতু ইসলামের এটা

একটা সুন্নত বা রীতি বলে স্বীকৃত, সেহেতু প্রত্যেকটি কাজের শুরুতে যার মধ্যে ভালাই ও কল্যাণ আশা করা হয়–এই আয়াত মঙ্গলের প্রতীক এবং সাহায্যের প্রার্থনাস্বরূপ, পাঠ করা হয়। এজন্যই, এই আয়াতটি শত্রুমিত্র এবং ছোটবড় সকলের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এমনকি, কোন ব্যক্তি যদি কোরআন শরীফের সমস্ত আয়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর থেকে থাকে, তবু আশা করা যায় যে, এই আয়াতটি সম্পর্কে সে অবশ্যই খবর রাখে। এখন, এই আয়াতের মধ্যে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ও উন্নত সত্যতা নিহিত রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে শোনা আবশ্যক। এসবের মধ্য থেকে একটি (সত্যতা) এই যে, এই আয়াত অবতীর্ণ বা নাযিল করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিরীহ ও বেখবর বান্দাদেরকেও যেন মারেফতের শিক্ষা দান করা যায় যে, সেই যে ওয়াযেবুল ওজুদ বা পরমাবশ্যক সত্তা (The Necessary Being) যার মহত্তম নাম বা ইস্‌মে আযম হচ্ছে 'আল্লাহ্' যা কোরআনী ঐশী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী সকল পারফেক্ট বা কামেল গুণাবলীর আধার এবং সকল প্রকারের দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র এবং সত্য উপাস্য বা মা'বূদে বরহক্ক এবং এক ও অদ্বিতীয় বা ওয়াহেদ ও লা-শরীক এবং সকল শুভ ও মঙ্গলের উৎস-প্রস্রবণ। এই ইস্‌মে আযম-এর অগণিত গুণাবলীর মধ্য থেকে দু'টি গুণ বিস্‌মিল্লাহ্ بِسۡمِ اللّٰهِ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে–'রহমানিয়ত' ও 'রহীমিয়ত'–(অযাচিত ও অসীম দানশীলতা এবং পুনঃ পুনঃ পরম দয়াময়তা)। এই দু'টি গুণের চাহিদা থেকেই কালামে ইলাহী বা ঐশী বাণীর অবতরণ এবং তার আলোকমালা ও কল্যাণরাজির প্রকাশ ও বিস্তার। এর ব্যাখ্যা এই যে, খোদাতায়ালার পবিত্র কালাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা এবং তা বান্দাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে **'রহমানিয়ত'** গুণের চাহিদা বা দাবী। কেননা, 'রহমানিয়ত' বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (এ সম্পর্কে পরে আরও বিস্তারিতভাবে বলা হবে) কোন ব্যক্তি কোন কর্মের পূর্বেই স্রেফ ঐশী উদারতা ও বদান্যতার প্রেরণা থেকেই এর প্রকাশ ঘটে। যেমন, খোদাতায়ালা সূর্য, চন্দ্র, পানি, বাতাস প্রভৃতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর বান্দাদের কল্যাণের নিমিত্তে। এ সমস্ত কিছুই 'রহমানিয়ত' গুণের উদারতা ও বদান্যতার কারণে হয়েছে। এবং কোন ব্যক্তিই এইরূপ দাবী করতে পারবে না যে, এগুলো তার কর্মের ফল বা পুরস্কারস্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। একইভাবে, খোদাতায়ালার কালাম, যা মানুষের সংশোধন এবং পথ-প্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তা-ও এই গুণের কারণেই অবতীর্ণ হয়েছে। এবং এমন কোন প্রাণী নেই, যে দাবী করতে পারে যে, তার কোন কর্ম, কোন সাধনা কিংবা কোন পবিত্র গুণের কারণে খোদার কালাম, যা তাঁর শরীয়ত সম্বলিত (বাণী), তা অবতীর্ণ হয়েছে। এটাই সেই কারণ, যদিও, পবিত্রতা ও সাধুতার বা চিত্তের শুদ্ধতার দাবীদার কিংবা সাধনা ও উপাসনায় জীবন অতিবাহিতকারী হাজারো ব্যক্তি অদ্যাবধি অতীত হয়ে গেছে, তবু খোদার পবিত্র ও পূর্ণ বাণী–যা তাঁর অবশ্য পালনীয় আদেশ ও নির্দেশাবলী দুনিয়াতে নিয়ে এসেছে, এবং তার উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করেছে মানুষকে–তা সবই অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই বিশেষ বিশেষ সময়ে যখন সেগুলির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, এটা জরুরী যে, খোদার পবিত্র কালাম কেবল সেই সমস্ত লোকের উপরেই নাযিল হবে যারা পবিত্রতা এবং সাধুতায় উচ্চমর্যাদার অধিকারী হবে। কেননা, পবিত্রতার সঙ্গে অপবিত্রতার কোন মিল নেই, সম্পর্ক নেই। অবশ্য, এটা জরুরী নয় যে, পবিত্রতা ও সাধুতার সকল ক্ষেত্রেই খোদার কালাম নাযিল হতে হবে। বরং,

খোদাতায়ালার হক্কানী শরীয়ত ও শিক্ষা অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টা যথার্থ প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং যখন যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং যামানার সংশোধনের জন্য অপরিহার্য মনে হয়েছিল যে, এখন খোদার কালাম অবতীর্ণ হোক, ঠিক সেই যামানাতেই সর্বদা খোদা তাঁর বাণী অবতীর্ণ করেছেন। আর কোনও যামানাতে, তা সেই যামানায় লাখো ব্যক্তি ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত হলেও, এবং তারা অন্তরে বিশুদ্ধতা ও সাধুতা অর্জনে যতদূর সম্ভব উন্নতি করলেও, তাদের উপরে খোদাতায়ালার সেই কামেল কালাম বা পূর্ণ ও পারফেক্ট বাণী অবতীর্ণ হয় না, যা কিনা ঐশী বা হক্কানী শরীয়ত সম্বলিত। তবে হ্যাঁ, পবিত্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে খোদাতায়ালার সম্বোধন ও কথাবার্তা অর্থাৎ মোকালামাত ও মোখাতাবাত হতে পারে। এবং তা-ও হয়ে থাকে সেই সময়ে যখন ঐশী প্রজ্ঞার বিবেচনায় কোন সঠিক প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উভয় প্রকারের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, হক্কানী শরীয়ত সেই প্রয়োজনের সময়ে অবতীর্ণ হয় যখন দুনিয়ার মানুষ অজ্ঞতা ও গোমরাহীর কারণে সত্যের সরল-সুদৃঢ় পথ থেকে বিচ্যুত হয় বা তার বিপরীতে পরিচালিত হয়, এবং তাদেরকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার এবং পরিচালিত করার জন্য এমন এক নতুন শরীয়তের প্রয়োজন দেখা দেয়, যা তাদেরকে ঐ সমস্ত বিদ্যমান দুরবস্থা ও দুর্বিপাকের সময় রীতিমত তত্ত্বাবধান বা তদারকী করতে পারে এবং তাদের অন্ধকার ও অজ্ঞতাকে আপনার পূর্ণ উজ্জ্বল বর্ণনার আলোকের সাহায্যে সর্বাংশে উদ্ধার করতে পারে। এবং যে ধরনের চিকিৎসা সেই ব্যাধিগ্রস্ত যামানার জন্য প্রয়োজন হয়, সেই ধরনের চিকিৎসা আপনার শক্তিশালী বয়ানের দ্বারা করে। কিন্তু, যেসব সম্বোধন ও কথাবার্তা (মোখাতাবাত ও মোকালামাত) ওলী-আল্লাহ্‌গণের সাথে হয়ে থাকে, তার জন্য অনুরূপ কোন বিরাট প্রয়োজন সৃষ্টি হওয়ার আবশ্যকতা নেই। বরং, প্রায় সময় এই শ্রেণীর কথাবার্তার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই হয়ে থাকে যে, ওলী বা সাধুব্যক্তির আত্মাকে তার কোন মুসিবত বা দুঃখ-দুর্দশা ও চেষ্টা-সাধনার সময়ে ধৈর্য ও অবিচলতার পোষাকে সজ্জিত রাখা, কিংবা কোন চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-শোকে কাতর অবস্থায় তাকে কোন সুসংবাদ দান করা। কিন্তু, খোদাতায়ালার কামেল ও পবিত্র বাণী নবী ও রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়, যেমনটা আমরা এক্ষুণি বর্ণনা করে এসেছি যে, তা কেবল যথার্থ প্রয়োজনের সৃষ্টি হলে তখনই নাযিল হয় যখন মানুষের জন্য তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে, আল্লাহ্‌র কালাম অবতীর্ণ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যথার্থ প্রয়োজনীয়তা বা জরুরতে হাক্কা। যেমন, তোমরা দেখতে পাও যে, সারাটা রাত অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে কখনই কোন আলো কোথাও অবশিষ্ট থাকে না, তখন তোমরা বুঝতে পার যে, এখন নতুন মাসের আগমন ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক তেমনিভাবে, যখন পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহীর অন্ধকার ঘনীভূত আকারে পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলে, তখন সুস্থ-বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে যে, এখন আধ্যাত্মিক চন্দ্রের উদয়ের লগ্ন আসন্নপ্রায়। একইভাবে, দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে মানুষেরা যখন ধ্বংসের অবস্থায় পতিত হয়, তখন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা বুঝতে পারে যে, রহমতের বৃষ্টিধারা নেমে আসার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। এবং খোদাতায়ালা যেমন তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কোন কোন মাসকে বর্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, অর্থাৎ সেই সমস্ত মাস যখন সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির জন্য বর্ষার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেই সমস্ত মাসে বৃষ্টি হয়েও

থাকে, এথেকে এটা ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই যে, বিশেষ করে ঐ মাসগুলোতেই লোকেরা বেশী বেশী পুণ্যকাজ করতে থাকে এবং অন্যান্য মাসগুলোতে পাপ ও পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত থাকে। বরং এটাই বুঝা উচিত যে, ঐসব মাসে যখন কৃষকদের বৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে, তখন বৃষ্টি হলে তদ্বারা সারা বছরের জন্যই শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তেমনিভাবে, আল্লাহ্‌র কালাম অবতীর্ণ হওয়াটাও কোন ব্যক্তির পবিত্রতা ও খোদাভীরুতা বা তাহারাত ও তাকওয়ার উপরে নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ, এই কালাম অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত কারণ এটা হতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি পবিত্রতার ও বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ উন্নতি লাভ করেছিল এবং সৎপথের জন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছিল, (তাই আল্লাহ্‌র কালাম অবতীর্ণ হয়েছে)। বরং যেমন আমরা কয়েকবার বলে এসেছি যে, আসমানী বা ঐশী গ্রন্থসমূহের নাযিল হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে–জরুরতে হাক্কা বা প্রকৃত আবশ্যকতা। অর্থাৎ দুনিয়া সেই অজ্ঞতা, সেই অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে এক আসমানী নূর–এক ঐশী আলো কামনা করে, যেন সেই নূর অবতীর্ণ হয়ে সেই অন্ধকারকে দূরীভূত করে, এবং এর দিকেই ইঙ্গিত করে খোদাতায়ালা তাঁর পাক কালামে বলেছেন : إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝ (নিশ্চয় আমরা একে অবতীর্ণ করেছি লায়লাতুল কদরে–ফয়সালার রজনীতে)। এই লায়লাতুল কদর-এর সাধারণ অর্থ যদিও 'সম্মানিত রাত্রি', কিন্তু কোরআনী আয়াতসমূহ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, দুনিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা তার গুপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর অভ্যন্তরে লায়লাতুল কদরের অবস্থাকেই ধারণ করে। এবং এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার দিনগুলিতে সত্যতা এবং ধৈর্য এবং ধর্মপরায়ণতা এবং ইবাদত খোদার নিকটে বড়ই কদর বা মর্যাদা রাখে। এবং ঐ অন্ধকারময় অবস্থা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সময়ে চরমত্বে পৌঁছে গিয়ে এক আজিমুশ্‌শান নূর–এক অতি মহিমান্বিত আলোর অবতরণ কামনা করছিল এবং ঐ অন্ধকারময় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত বান্দাদের প্রতি রহম করে 'রহ্‌মানিয়তে'র গুণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং আসমানী বরকতসমূহ অর্থাৎ ঐশী কল্যাণসমূহ পৃথিবীর প্রতি মনোনিবেশ করে। অতএব, সেই অন্ধকারময় অবস্থাই পৃথিবীর জন্য মোবারক বা মঙ্গলময় হয়ে উঠলো এবং পৃথিবী এজন্য এক মহান মর্যাদাপূর্ণ রহমতের অংশ লাভ করলো। এবং এক কামেল ইনসান–পরিপূর্ণ মানব ও সাইয়েদুর রুসুল–যাঁর মত আর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি এবং করবেও না–তিনি এই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হলেন হেদায়াত দানের জন্য, এবং পৃথিবীর জন্য এই উজ্জ্বল গ্রন্থ নিয়ে এলেন যার কোন দৃষ্টান্ত কোন চক্ষু কখনও দেখেনি। সুতরাং এ ছিল খোদাতায়ালার সর্বোত্তম আধ্যাত্মিকতার এক মহিমান্বিত আলোকের প্রকাশ, যা সেই অজ্ঞতা ও অন্ধকারের সময় এমন আজিমুশ্‌শান নূর–অতি মহিমান্বিত আলো অবতীর্ণ করেছিল, যার নাম 'ফুরকান', যা হক্ক ও বাতিল বা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করে দেখায়, এবং যা বস্তুতঃ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত এবং মিথ্যাকে পর্যুদস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে। উহা ঐ সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে যখন পৃথিবী এক আধ্যাত্মিক মরণে মৃত্যুবরণ করেছিল। এবং জলে ও স্থলে ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং, তা অবতীর্ণ হয়ে সেই কাজ সম্পাদন করে দেখিয়েছে যার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং ইঙ্গিত করে বলেছেন :

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ

অর্থাৎ, পৃথিবী মরে গিয়েছিল, তখন খোদা তাকে নতুন করে জীবন দান করছেন। এখন, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই যে কোরআন শরীফের নুযূল বা অবতরণ, যা পৃথিবীকে জীবন দান করার জন্য হয়েছিল, তা 'রহমানিয়ত' গুণেরই প্রেরণা থেকে হয়েছিল। এ-ই সেই গুণ, যা কখনও দৈহিক বা বাহ্যিকভাবে আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের প্রতি মনোযোগী হয় এবং বিশুষ্ক যমীনের উপরে রহমতের বারি বর্ষণ করে। এবং সেই একই গুণ কখনও বা রূহানী বা আধ্যাত্মিকভাবে আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে সেই সমস্ত ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তদের অবস্থার প্রতি রহম করে যারা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হয়, এবং হক্ক ও সাদাকাত বা সত্য ও সত্যতার খাদ্য, যা কিনা রূহানী জিন্দেগীর মূল প্রয়োজন, তা তাদের কাছে থাকে না। তখন, রহমান খোদা, যেভাবে দৈহিক খাদ্য প্রয়োজনের সময়ে দান করে থাকেন, তেমনিভাবে, তিনি তাঁর পূর্ণ রহমতের চাহিদা অনুযায়ী রূহানী খাদ্যও যথার্থ প্রয়োজনের সময় বিপুল পরিমাণে দান করে থাকেন। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, খোদাতায়ালার কালাম তাঁর মনোনীত বান্দাগণের উপরেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে, যাঁদের উপর খোদা রাজী থাকেন। এবং তাঁদেরই সঙ্গে তিনি মোকালামাত ও মোখাতাবাত অর্থাৎ কথাবার্তা বলেন ও সম্বোধন করেন যাঁদের উপরে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু, একথা কোনমতেই ঠিক নয় যে, যার উপরে রাজী থাকেন, সন্তুষ্ট থাকেন, তার উপরে খামাখাই বিনা প্রয়োজনে আসমানী কিতাব বা ঐশীগ্রন্থ নাযিল হয়ে যাবে বা নাযিল করা হবে, কিংবা, খোদাতায়ালা, যথার্থ কোন প্রয়োজন ছাড়াই শুধু পবিত্রতার কারণে আবশ্যক ও স্থায়ীরূপে সব সময়ে তার সঙ্গে কথা বলবেন। বরং, খোদার কিতাব ঐ সময়েই নাযিল হয় যখন সত্যসত্যই তা নাযিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংক্ষেপে কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ওহী বা ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার 'রহমানিয়ত'; এ কারও কোন কর্মের ফল নয়। এ এক অতি মহান সত্যতা, যে সম্পর্কে আমাদের বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মসমাজীরা এবং অন্যান্যরা সম্পূর্ণ অনবহিত।

অতঃপর, অনুধাবনযোগ্য বিষয় হচ্ছে, কোন মানুষের পক্ষে ঐশী বাণী বা কালামে ইলাহীর কৃপা লাভ করে কৃপামণ্ডিত হওয়া, এবং তার কল্যাণরাজি ও আলোকসমূহ থেকে উপকৃত হয়ে লক্ষ্যস্থলে বা মন্‌যিলে মকসূদে উত্তীর্ণ হওয়া, এবং তার সাধনার ফল লাভ করা সবই 'রহীমিয়ত'-এর সমর্থনে সম্ভব হয়ে থাকে। এবং এই লক্ষ্যেই খোদাতায়ালা 'রহমানিয়ত' গুণের উল্লেখের পরে 'রহীমিয়ত' গুণের বর্ণনা করেছেন, যাতে বুঝা যায় যে, কালামে ইলাহীর যে ক্রিয়া বা প্রকাশ মানুষের হৃদয়ে ঘটে, তা 'রহীমিয়ত' গুণের প্রভাবেই ঘটে। যে পরিমাণে কেউ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যে পরিমাণে কারো হৃদয়ে আন্তরিকতা ও সততার সৃষ্টি হয়, যে পরিমাণে কেউ যথাযথ চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে আনুগত্য বরণ করে, সেই পরিমাণেই কালামে ইলাহীর প্রভাবে তার হৃদয় প্রভাবান্বিত হয়, সেই পরিমাণেই তার আলোসমূহ থেকে সে লাভবান হয়ে থাকে। এবং তার মধ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তিগণের আলামত বা চিহ্ন প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সত্যতা বা সাদাকাত যা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে, এই আয়াত কোরআন শরীফ শুরু করার

জন্য নাযিল হয়েছে এবং তা পাঠ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই সর্বোত্তম গুণাবলীর পূর্ণ আধার যিনি তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। যাঁর গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে 'রহমান'; যে কারণে তিনি স্রেফ অনুগ্রহ করে, কৃপাভরে সত্যান্বেষীর জন্য শুভ ও কল্যাণ ও সৎপথ প্রাপ্তির উপায় ও অবলম্বন সৃষ্টি করে থাকেন। এবং তাঁর দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, তিনি 'রহীম'। অর্থাৎ তিনি অধ্যাবসায়ীদের চেষ্টা-সাধনাকে বিফল হতে দেন না, বরং তাদের চেষ্টা-চরিত্রের সুন্দর ও শুভ পরিণতির ব্যবস্থা করেন এবং তাদের শ্রমের ফল তাদেরকে দান করেন। এবং এই উভয় গুণ অর্থাৎ, 'রহ্‌মানিয়ত ও রহীমিয়ত'–এমন যে, এ দু'টি গুণ-এর অবর্তমানে কোন কাজই তার শেষ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না, তা সে কাজ দুনিয়াবী হোক আর দ্বীনি হোক। আর যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করো, তাহলে সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় পরিকল্পনাকে পরিণতি দান করার জন্য এই দু'টি গুণ সব সময়ে সব অবস্থায় কাজ করে যাচ্ছে। খোদাতায়ালার 'রহমানিয়ত' সেই সময় থেকেই প্রকাশিত হয়ে চলেছে যখন মানুষের সৃষ্টি হয়নি। অতএব এই 'রহমানিয়ত' মানুষের জন্য এমন সব উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে যাচ্ছে যা সবই তার ক্ষমতা বহির্ভূত এবং যেগুলিকে সে কোন প্রকার পরিকল্পনা বা চেষ্টা-তদবীর দ্বারা অর্জন করতে পারে না। এবং ঐ সকল উপায়-উপকরণ কোন কর্মের পুরস্কারস্বরূপও দান করা হয় না। বরং তা সবই অনুগ্রহ ও কৃপা-করুণার পন্থায় দান করা হয়। যেমন, নবীগণের আগমন হওয়া। কিতাবসমূহের নাযিল হওয়া। বৃষ্টিপাত হওয়া। সূর্য এবং চন্দ্র এবং হাওয়া এবং মেঘ প্রভৃতির আপন আপন কাজে নিয়োজিত থাকা। এবং স্বয়ং মানুষের বিভিন্ন প্রকারের শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করা, এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ও অবকাশ এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আয়ু লাভ করা। এসবই ঐ সমস্ত বিষয় যা 'রহমানিয়ত' গুণের চাহিদা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়।

অনুরূপভাবে, খোদাতায়ালার 'রহীমিয়ত' তখনই প্রকাশিত হয় যখন মানুষ সব ধরনের সামর্থ্য লাভ করে খোদাপ্রদত্ত শক্তিগুলিকে কোন কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে, এবং যতদূর সম্ভব নিজের জোর ও শক্তি ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে, তখন ঐশী-প্রকৃতি আপন স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই তার চেষ্টাসমূহকে বিফল হতে দেয় না। বরং তার সকল প্রচেষ্টারই সুফল প্রদান করে। অতএব, এ হচ্ছে তাঁর আগাগোড়াই সেই 'রহীমিয়ত' যা মানুষের নিষ্প্রাণ প্রচেষ্টায় প্রাণের সঞ্চার করে। জানা আবশ্যক যে, প্রসিদ্ধ এই আয়াতটি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হলো, কোরআন শরীফ (অধ্যয়ন) শুরু করার সময় আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বগুণাবলীর সম্পূর্ণ সত্তার 'রহ্‌মানিয়ত' ও 'রহীমিয়ত'–থেকে সাহায্য এবং কল্যাণ কামনা করা। 'রহ্‌মানিয়ত' গুণ থেকে বরকত বা কল্যাণ প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য এটাই যে, সেই কামেল বা পূর্ণ সত্তা যেন আপনার রহমানিয়তের কারণে ঐ সমস্ত উপায়-উপকরণকে স্রেফ করুণা করে, কৃপাভরে দান করেন, যার প্রয়োজন পড়ে কালামে ইলাহীর অনুবর্তিতায় কোন চেষ্টা-সাধনা চালানোর পূর্বেই। যেমন, আয়ু বৃদ্ধি করে দেওয়া, অবকাশ বা ফুরসত ও ফারাগত লাভের অবস্থা সৃষ্টি করা, প্রয়োজনীয় ও যথোপযোগী সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা, ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ্য ঠিক রাখা। এবং

ক্রমশঃ কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে না দেওয়া যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এমন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে না দেওয়া যাতে চিত্তের একাগ্রতা ব্যাহত হতে পারে। সংক্ষেপে, সর্বপ্রকারের সামর্থ্য দান করা। এ সমস্ত কিছুই অর্জিত হয় 'রহমানিয়ত' গুণ থেকে। এবং, 'রহীমিয়ত'-গুণ থেকে বরকত প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য এটাই যে, সেই কামেল সত্তা যেন আপন রহীমিয়তের কারণে মানুষের প্রচেষ্টাসমূহের সুফল প্রদান করে এবং মানুষের শ্রমকে নিষ্ফল হওয়া থেকে রক্ষা করে। এবং তার সাধনা ও সংগ্রামের পর তার কাজকে কল্যাণমণ্ডিত করে। অতএব, এই পদ্ধতিতে খোদাতায়ালার এই দুই গুণ–রহ্‌মানিয়ত ও রহীমিয়ত–থেকে কালামে ইলাহী (কোরআন পাঠ) শুরু করার সময়ে, বরং প্রত্যেকটি মহৎ কাজ শুরু করার পূর্বে কল্যাণ ও সাহায্য প্রার্থনা করাটা এক অত্যন্ত উঁচুস্তরের সত্যতা বা সাদাকাত, যার মাধ্যমে মানুষ হকীকতে তৌহীদ বা তৌহীদ সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে সমর্থ হয়। এবং সে আপনার অজ্ঞতা, অসতর্কতা, নির্বুদ্ধিতা এবং বিভ্রান্তি, অসহায়তা ও তুচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সকল কৃপা ও কল্যাণের উৎসের মাহাত্ম্য ও গৌরবের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এবং নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে দরিদ্র, মিসকীন, হেয় ও কিছু-না বা না-চীজ জেনে সর্বশক্তিমান খোদাওন্দতায়ালার কাছ থেকে তাঁর রহ্‌মানিয়ত ও রহীমিয়ত-এর কল্যাণরাজি প্রার্থনা করে। যদিও খোদাতায়ালার এইসব গুণ স্বতস্ফূর্তরূপেই ক্রিয়াশীল রয়েছে, তবু সেই সর্বজ্ঞ (খোদা) আদিকাল থেকেই মানুষের জন্যে এই প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, তার দোয়া এবং তার সাহায্য প্রার্থনা, তার সাফল্যের মধ্যে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। যারা হৃদয়ের সততার সঙ্গে দোয়া করে এবং তাদের দোয়া যদি আন্তরিকতার চরমত্বে পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই ঐশী কৃপারাজি বা ফয়যানে ইলাহী তাদের সমস্যাবলী সমাধানের প্রতি নিবিষ্ট হবে। এবং প্রতিটি মানুষ, যে আপন দুর্বলতাসমূহের প্রতি খেয়াল রাখে এবং আপন দোষ-ত্রুটিসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখে, সে কোন কাজই স্বাধীনভাবে এবং পূর্ণ আশাবাদী বা আত্মনির্ভরশীল হয়ে শুরু করে না। কেননা, প্রকৃত দাসত্ব বা উবুদিয়ত তাকে এটা উপলব্ধি করায় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা–যিনি নিরংকুশ নিয়ন্ত্রক–তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। এই প্রকৃত দাসত্বের প্রেরণা সেই প্রত্যেক হৃদয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, যা আপন স্বভাবের সরলতার উপরে কায়েম থাকে এবং আপন দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ থাকে। সুতরাং, সেই সৎ ব্যক্তি যার আত্মার মধ্যে কোন প্রকার অহংকার ও ঔদ্ধত্য স্থান করে নিতে পারেনি, এবং যে তার দুর্বলতা এবং তুচ্ছতা এবং তার নিরস্তিত্বতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল, এবং নিজের সত্তাকে কোন কাজে সাফল্য লাভের যোগ্য বলে মনে করে না এবং যখন সে কোন কাজ আরম্ভ করে তখন তার নিজের মধ্যে কোন শক্তি, কোন ক্ষমতা সে দেখতে পায় না; তাই তার দুর্বল আত্মা নির্দ্বিধায় আসমানী অর্থাৎ ঐশী শক্তির প্রার্থী বা মুখাপেক্ষী হয়। সে তখন সব সময়ে খোদাতায়ালার শক্তিমান অস্তিত্বকে, তার পূর্ণতা ও গৌরবসহ প্রত্যক্ষ করে। এবং সে উপলব্ধি করে যে, তার প্রতিটি কাজের সাফল্য রহ্‌মানিয়ত ও রহীমিয়ত-এর উপরে নির্ভরশীল। অতএব, সে সঙ্গে সঙ্গেই, তার ত্রুটিপূর্ণ ও অযোগ্য

প্রচেষ্টা শুরুর পূর্বেই, بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) দোয়ার মাধ্যমে ঐশী সাহায্য প্রার্থনা করে। কাজেই, সে তার বিনয় ও মিনতির কারণে এমন যোগ্যতা অর্জন করে যে, তখন সে খোদার শক্তি থেকে শক্তি এবং ক্ষমতা থেকে ক্ষমতা, এবং খোদার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে, এবং আপন উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা অর্জন করে। একথা প্রমাণের জন্য কোন তর্কশাস্ত্র বা কোন দর্শনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, প্রতিটি মানুষের আত্মায় এটা উপলব্ধি করার মত যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রকৃত প্রাজ্ঞজন বা আরেফে সাদেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এর সততার ব্যাপারে স্বতস্ফূর্তভাবে সাক্ষ্যদান করে। খোদার কাছে বান্দার সাহায্য প্রার্থনা করাটা এমন কোন ব্যাপার নয় যাকে বেহুদা বা বানোয়াটী বলা যাবে। কিংবা, তা শুধু ধারণার উপরেই নির্ভরশীল, এবং এথেকে কোন বাস্তব ফলাফল লাভ করা যায় না। বরং খোদাওন্দ করীম যিনি সত্যি সত্যিই এই জগতের স্থিতিদাতা এবং যার সাহায্য-সহায়তায় সত্যি সত্যিই এই জগতের কিশ্‌তী চলছে তাঁর চিরন্তন নিয়মের আওতায় এই সত্যতা আদিকাল থেকেই চলে আসছে যে, যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের নিজেদের সত্তাকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে নিজেদের কাজে-কর্মে তাঁর সাহায্য সমর্থন প্রার্থনা করে এবং তাঁরই নাম নিয়ে নিজেদের কাজ-কর্ম শুরু করে সেই সমস্ত ব্যক্তিকে তিনি সাহায্য-সমর্থন দিয়ে থাকেন। যখন তারা প্রকৃতই আপন বিনয় ও দাসত্ব বা উবুদিয়ত-এর দরুন বা-খোদা বনে যায় (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে খোদামুখী হয়ে যায়), তখন খোদার সাহায্য সহায়তা তাদের সঙ্গী হয়ে যায়। সংক্ষেপে, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বা শানদার কাজকর্মের প্রারম্ভে সেই কৃপা ও করুণার প্রস্রবণের উৎস থেকে, যিনি রহমান ও রহীম, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাটা নেহাত আদবেরই কথা, উবুদিয়ত ও বিনয়েরই পদ্ধতি। এবং এটা এমন একটা জরুরী পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে তৌহীদ ফিল আ'মাল (অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ব) এর পরিচয় লাভের প্রথম ধাপ শুরু হয়ে যায়। এই পন্থায় মানুষ কচি বাচ্চাদের মত নম্রতা ও সরলতা অবলম্বন করে, এবং সেই সমস্ত ঔদ্ধত্য থেকে পবিত্র হয়ে যায়, যা দুনিয়ার গর্বিত বুদ্ধিমানদের হৃদয়ে ভরা থাকে। এছাড়া নিজেদের কমজোরী স্বীকার করে এবং খোদায়ী সাহায্যের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তারা সেই মারেফত থেকেও জ্ঞান লাভ করে যা 'আহ্‌লুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌র লোকদেরকে দান করা হয়। এবং নিঃসন্দেহে, মানুষ যতটা এই পদ্ধতিকে শক্তভাবে অবলম্বন করে, যতটা এর উপরে আমল বা অনুশীলন করা কর্তব্য বলে মনে করে, যতটা একে পরিত্যাগ করাতে নিজের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করে, ততটাই তার তৌহীদ (অর্থাৎ তৌহীদ সম্পর্কিত জ্ঞান) পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং ততটাই সে তার ঔদ্ধত্য বা অহংকার এর আত্ম-গরিমার মালিন্য থেকে পবিত্র হয়ে যায়। এবং ততটাই তকলিফ ও বানোয়াটী বা কৃত্রিমতার অন্ধকার তার চেহারা থেকে অপসৃত হয়ে যায়। এবং তার চেহারা থেকে আন্তরিকতা ও সরলতার আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। অতএব, এটাই সেই সত্যতা যা ধীরে ধীরে মানুষকে 'ফানাফিল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌তে বিলীন)-এর স্তরে পর্যন্ত উন্নীত করে। এমন কি, সে দেখতে পায় যে, কোন কিছুই তার নিজের নয় সব কিছুই সে খোদার

কাছে থেকেই পেয়ে থাকে। যেখানেই এই পদ্ধতিকে কেউ অবলম্বন করে সেখানেই তৌহীদের সুঘ্রাণ প্রথম বারের মত তার কাছে পৌঁছতে শুরু করে এবং তার মন ও মস্তিষ্ক ঘ্রাণময় হয়ে ওঠতে থাকে, শর্ত এই যে, তার ঘ্রাণ শক্তিতে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। সংক্ষেপে, এই সত্যতা অবলম্বন করার মধ্য দিয়ে সত্যান্বেষীকে এই স্বীকৃতি দান করতে হয় যে, সে নিজে তুচ্ছ, সে কিছুই না। পক্ষান্তরে তাকে এই সাক্ষ্যও দান করতে হয় যে, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু হচ্ছেন নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং সমস্ত কৃপা ও করুণার উৎস-প্রস্রবণ। এবং এ দু'টো এমন বিষয় যা কিনা সত্যান্বেষীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং 'ফানা'-এর মর্যাদা লাভের জন্য জরুরী শর্ত। এই জরুরী শর্ত উপলব্ধি করার জন্য এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট যে, বৃষ্টি যদিও ব্যাপক এলাকা জুড়ে হয়, তবু তা আমাদের তাদের উপরেই বর্ষিত হয় যারা বৃষ্টির সময়ে তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, যারা অনুসন্ধান করে তারাই প্রাপ্ত হয়। যারা চায় তাদেরকেই দেওয়া হয়। যারা কোন কাজ শুরু করার সময় নিজেদের দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষমতার উপরে ভরসা রাখে, এবং খোদাতায়ালার উপরে ভরসা রাখে না, তারা সেই সর্বশক্তিমান সত্তা-যিনি স্বীয় চিরস্থায়িত্ব দ্বারা সমগ্র বিশ্ব-জগতকে পরিবেষ্টন করে আছেন, তাঁকে সামান্যতমও সনাক্ত করতে পারে না বা স্বীকৃতি দেয় না। তাদের ঈমান সেই শুক্‌নো ডালের মত যার সঙ্গে তার আপন সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের আর কোন সম্পর্ক থাকে না। সেটি এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, তার আপন বৃক্ষের সজীবতা এবং ফুল এবং ফল থেকে কিছুই সে আর পায় না। শুধু বাহ্যিক একটা জোড়া থাকে মাত্র, যা সামান্য একটা বাতাসের ধাক্কা লাগলেই বা কেউ ধরে টান মারলেই ভেঙ্গে পড়ে। এবং এটাই হচ্ছে শুষ্ক দার্শনিকদের ঈমানের অবস্থা। এরা জগতের স্থায়িত্ব-দাতার সাহায্য-সমর্থনের উপরে কোন ভরসা রাখে না, এবং সেই কৃপা ও কল্যাণের উৎস-প্রস্রবণ যাঁর নাম আল্লাহ্ তাঁর প্রতি কখনই কোন অবস্থাতেই তাদের চরম মুখাপেক্ষিতাকে স্বীকার করে না, উপলব্ধি করে না। অতএব তারা প্রকৃত বা হকীকি তৌহীদ থেকে এত দূরে পড়ে আছে, যেমন পড়ে থাকে অন্ধকার আলো থেকে দূরে। তারা এটা বুঝতেই পারে না যে, নিজেদের সত্তাকে তুচ্ছ এবং মৃতবৎ জ্ঞান করে সর্বশক্তিমানের অসীম ক্ষমতার নীচে এসে পড়াই হচ্ছে উবুদিয়ত বা দাসত্বের স্তরসমূহের সর্বশেষ সীমা এবং তৌহীদের চূড়ান্ত মোকাম বা শীর্ষবিন্দু, যা থেকে 'ফানা-এ আতাম' বা সাকল্য ও সর্বোত্তম বিলীনতার প্রস্রবণ উথলে উঠতে থাকে এবং মানুষ তার আপন সত্তা বা অহম ও ইচ্ছা- অভিলাষ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়, এবং পরিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে খোদাতায়ালার নিয়ন্ত্রণের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। এক্ষেত্রে, ঐ সকল শুষ্ক দার্শনিকের সেই যুক্তিকেও অন্তঃসারশূন্য মনে করাই সঙ্গত যখন তারা বলে যে, কোন কাজ শুরু করার পূর্বে খোদার সাহায্য প্রার্থনার কি দরকার। খোদা তো আগে থেকেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে নানান শক্তি দিয়ে রেখেছেন। কাজেই, এই সমস্ত শক্তি থাকা অবস্থায় আবারও খোদার কাছে শক্তি প্রার্থনা করাটা অবান্তর এবং বাড়া-বাড়ি। (এই যুক্তি অন্তঃসারশূন্য)। কেননা, আমাদের কথা হচ্ছে, সন্দেহ নেই একথা ঠিক যে, খোদাতায়ালা বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাাদেরকে কিছু কিছু ক্ষমতা দান

করেছেন, কিন্তু তবু, সেই জগতের স্থিতিদাতার রাজত্ব আমাদের মাথার উপরেই রয়েছে, দূরে নয় এবং আমাদের থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। এবং তাঁর সাহায্য-সমর্থন থেকে তিনি আমাদেরকে আলাদাও রাখতে চান না। এবং আপনার অন্তহীন কৃপা ও কল্যাণরাজি থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত রাখতেও চান না, রাখেনও না। তিনি আমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা একভাবে সীমিতই বটে, কিন্তু আমরা তাঁর কাছে যা চাই তা তো সীমাহীন। এছাড়া, যে কাজ আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত, তা সম্পাদন করার জন্য তো আমাদেরকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এখন, যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করো এবং সমস্ত দর্শনকেই কাজে লাগাও তাহলে দেখতে পাবে যে, কামেল বা পারফেক্টরূপে কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের দৈহিক শক্তি আমাদের সুস্বাস্থ্যের উপরে নির্ভরশীল এবং আমাদের সুস্বাস্থ্য আবার এমন অনেক কিছুর উপরে নির্ভরশীল যার কতকগুলি স্বর্গীয় এবং কতকগুলি পার্থিব। এবং এগুলির সবটাই আমাদের ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত। এ তো গেল একটা মোটা কথা যা সাধারণ মানুষের বুঝবার উপযোগী করে বলা হলো। কিন্তু যেভাবে প্রকৃতপক্ষে সেই জগতের স্থিতিদাতা স্বয়ং সমস্ত কারণের আদি কারণ হওয়ার দরুন আমাদের প্রকাশ্য আমাদের গোপন এবং আমাদের আদি আমাদের অন্ত এবং আমাদের ঊর্ধ আমাদের অধঃ এবং আমাদের ডান আমাদের বাম এবং আমাদের হৃদয়, আমাদের প্রাণ এবং আমাদের আত্মার তামাম ক্ষমতাকে পরিবেষ্টন করে আছেন, তা এমন একটি সূক্ষ্ম বিষয় যার কিনারায়ও মানবীয় বুদ্ধি পৌঁছতে সক্ষম নয়। এবং তা এক্ষেত্রে বুঝাবারও দরকার নেই। কেননা, আমরা উপরে যা বলে এসেছি তা-ই বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ ও আপত্তি খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। সংক্ষেপে জগতের স্থিতিদাতার কৃপা ও কল্যাণ লাভের এটাই পদ্ধতি যে, নিজের সমস্ত শক্তি এবং জোর এবং ক্ষমতা দিয়েই আপনার পরিত্রাণ চাইতে হবে। এবং এই পদ্ধতি কোন নতুন পদ্ধতি নয় বরং এটা সেই পদ্ধতিই যা আদিকাল থেকেই বনী আদমের প্রকৃতিতে সহজাতরূপে বিদ্যমান রয়েছে। যে ব্যক্তি দাসত্বের বা উবুদিয়তের তরীকায় বা পদ্ধতিতে চলতে চায় সে এই তরীকাই অবলম্বন করে; এবং যে ব্যক্তি খোদার কৃপা-কল্যাণের প্রত্যাশী হয় সে এই পথেই পা বাড়ায় এবং যে ব্যক্তি রহমতের প্রাপক হতে চায় সে এই সব চিরন্তন নিয়মাবলীর অনুসরণ করে। এবং এই নিয়মাবলী নতুন কিছু নয়। এ সব খৃষ্টানদের খোদার ন্যায় কোন আজগুবী ব্যাপার নয়। বরং খোদাতায়ালার এই সব নিয়ম-কানুন অপরিবর্তনীয় যা আদিকাল থেকেই রীতিমত বিধিবদ্ধরূপে চলে আসছে, এবং যা সুন্নতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র রীতি। এবং যা হামেশাই জারি রয়েছে। যার সত্যতা প্রচুর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যেক সত্যান্বেষীর সামনে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত........................

প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রত্যেকটি বরকত এই পথেই আসে। সেই যে সত্তা যিনি সব কিছুকেই পরিবষ্টেন করে আছেন, যিনি সমস্ত কারণের আদি কারণ, সমস্ত কৃপা ও কল্যাণের উৎস-প্রস্রবণ যার নাম কোরআন শরীফের বাগধারায় 'আল্লাহ্' তিনি স্বয়ং মনোযোগী হয়ে প্রথমে তাঁর গুণ 'রহ্মানিয়ত'এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং যা কিছু

প্রয়োজন তা সবই কারো চেষ্টা-তদ্‌বীরের পূর্বেই স্রেফ আপন কৃপা করুণা ও অনুগ্রহ বশে, কারো কোন কর্ম ছাড়াই, প্রকাশিত করেছেন। রহ্‌মানিয়ত গুণের সমস্ত কাজ পূর্ণরূপে পরিণতি লাভ করলে পর মানুষ যখন সামর্থ্য লাভ করে নিজের শক্তিসমূহের মাধ্যমে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার দায়িত্ব পালন করে তখন আল্লাহ্‌তায়ালার দ্বিতীয় কাজ হয় তাঁর রহীমিয়ত' গুণের প্রকাশ ঘটানো এবং বান্দা যে পরিশ্রম করেছে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার জন্য সুফল প্রদান করা; এবং তার পরিশ্রমকে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে তার প্রত্যাশিত ফল তাকে দান করা। এই দ্বিতীয় গুণের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, যে খুঁজে সে পায়, যে চায় তাকে দেওয়া হয়, যে কড়া নাড়ে তার জন্যে খুলে দেওয়া হয়।...............................

এইরূপ সন্দেহ পোষণ করা যে, তাহলে সাহায্যের জন্য এইরূপ প্রার্থনা করা কোন কোন সময় নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়ে যায় কেন এবং কেনই বা খোদাতায়ালার রহ্‌মানিয়ত ও রহীমিয়ত সাহায্যের জন্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে সব সময় প্রকাশিত হয় না? এইরূপ সন্দেহ স্রেফ সত্যতা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি থেকেই সৃষ্টি হয়। কেননা, খোদাতায়ালা ঐ সমস্ত দোয়া অবশ্যই শুনে থাকেন যা আন্তরিকতার সাথে করা হয়। এবং সাহায্য প্রার্থীকে যথাযথরূপে সাহায্য করাও হয়। তবে, কখনও কখনও এমনও হয় যে, মানুষের সাহায্যের জন্য প্রার্থনার মধ্যে আন্তরিকতাই থাকে না। মানুষ না মনে প্রাণে বিনয় সহকারে ঐশী সাহায্য প্রার্থনা করে, না তার আধ্যাত্মিক অবস্থা যথোপযোগী হয়। বরং তার ঠোঁটে থাকে প্রার্থনা কিন্তু অন্তরে অনীহা অথবা লোক দেখানো ভাব। কিংবা কখনও এমন হয় যে, তার প্রার্থনা তো খোদা শোনেন এবং তার জন্য আপনার পূর্ণ প্রজ্ঞায় যা কিছু যথোপযুক্ত ও উত্তম বিবেচনা করেন তা দানও করেন, কিন্তু নাদান মানুষ খোদাতায়ালার সেই গুপ্ত দানকে সনাক্ত করতে পারে না, এবং নিজের মুর্খতা ও অসতর্কতার কারণে অভিযোগ ও আপত্তি করা শুরু করে দেয়। সে এই আয়াতেরও মর্ম অনুধাবন করতে পারে না।

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ এটা খুবই সম্ভব যে, তোমরা কোন বস্তুকে ঘৃণা কর, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, এবং এটাও সম্ভব যে, তোমরা কোন জিনিষকে ভালবাস, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। *(২ঃ২১৭)*

আমাদের এই সমস্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম কত বড় এক মহিমান্বিত সত্যতা বা সাদাকাত, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে হকীকি তৌহীদ, উবুদিয়ত এবং আন্তরিকতার উন্নতি লাভের জন্য অতিশয় উৎকৃষ্ট উপায় ও অবলম্বনসমূহ যার কোন তুলনা অন্য আর কোন গ্রন্থেই নেই। আর যদি কেউ দাবী করে যে, না, তা অন্য গ্রন্থেও আছে; তাহলে সে পারলে এই সাদাকাতসহ অপরাপর সাদাকাত যা আমরা নিম্নে বর্ণনা করছি তা পেশ করুক।

এক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন অদূরদর্শী এবং নাদান দুশ্‌মন বিস্‌মিল্লাহ্-এর রচনারীতি সম্পর্কেও আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। এই সব আপত্তিকারীদের একজনের নাম পাদ্রী এমাদুদ্দীন। সে তার পুস্তক 'হেদায়াতুল মুসলেমীন'-এর মধ্যে নিম্নোক্ত আপত্তিগুলো উত্থাপন করেছে। আর এক ব্যক্তি হচ্ছে অমৃতসরের এক উকীল বাওয়া নারায়ন সিং। এই ব্যক্তি পাদ্রীর আপত্তিগুলোকে সঠিক মনে করে তার অন্তরের বিদ্বেষ-

বশতঃ ঐ সকল বাজে ও অন্তঃসারশূন্য আপত্তিকেই তার সাময়িকী 'বিদ্যা প্রকাশক'-এ উদ্ধৃত করেছে। সুতরাং, আমরা এখানে সেই আপত্তিগুলো এবং সেই সঙ্গে সেগুলোর জবাব লেখা সমীচীন বোধ করছি। এতে করে ন্যায়বান ব্যক্তিরা বুঝতে পারবেন যে, উদগ্র ধর্ম-বিদ্বেষ আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরাত্মাকে কত বেশী অন্ধ করে তুলেছে; দৃষ্টিহীন করে ফেলেছে। যার দরুন তারা অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোককে মনে করছে অন্ধকার এবং অতি সুমিষ্ট আঘ্রাণকেও বলছে দুর্গন্ধ। অতএব, জানা প্রয়োজন যে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম-এর রচনারীতির উপরে যে আপত্তি ঐ লোকগুলো তুলেছে তা হচ্ছে بِسْمِ اللّٰهِ বিস্‌মিল্লাহ-এর মধ্যে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আর রহ্‌মানির রাহীম যে অন্বয় বা পারম্পর্যে (Sequence) ব্যবহৃত হয়েছে তা সঠিক হয় নি। সঠিক অন্বয় হতো যদি বলা হতো রহীমুর রহমান। কেননা, খোদার যে নাম রহ্‌মান তা হচ্ছে সেই রহমত (বা দয়া) সম্পর্কিত যা সীমাহীন ও সাধারণ বা আম। এবং রহীম শব্দ 'রহ্‌মান' শব্দের তুলনায় কম 'রহমত' সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় যা কিনা সীমিত ও বিশিষ্ট বা খাস। এবং রচনারীতির এটাই নিয়ম যে, যা সসীম তা অসীম -এর অগ্রে বা পূর্বে ব্যবহৃত হয়, অসীম সসীমের অগ্রে ব্যবহৃত হয় না।

এই হচ্ছে সেই আপত্তি যা ঐ দুই ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করে উত্থাপন করেছে এই কালাম-এর বিরুদ্ধে। অথচ, এই কালাম-এর রচনারীতির ঔৎকর্ষকে সকল আরবী ভাষাভাষী লোকেরা যাদের মধ্যে বড় বড় কবিও ছিল- কট্টর বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করে নিয়েছে। বড় বড় শত্রুরাও এই কালাম-এর উন্নত রচনাশৈলী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এবং তাদের মধ্য থেকে অনেকেই যাঁরা ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে সুপন্ডিত ছিলেন বা অলংকারশাস্ত্রবিদ ছিলেন এবং ন্যায়বানও ছিলেন-তাঁরা কোরআনের ভাষারীতি ও রচনাশৈলীকে মানবীয় ক্ষমতা বহির্ভূত বলে জ্ঞান করে এবং একে এক মহা অলৌকিক নিদর্শন বা মোজেযা বলে বিশ্বাস করে ঈমান এনেছিলেন। এদের সাক্ষ্যের কথা কোরআন শরীফের বহু জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে।

আফসোস যে, এই নাদান খৃষ্টান লোকটির আজও পর্যন্ত এই খবরও নেই যে, প্রকৃত ভাষারীতি বা রচনারীতি এই বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যে, সসীমকে অসীমের পূর্বে সর্বক্ষেত্রেই সর্বাবস্থায় খামাখা ব্যবহার করতে হবে। বরং রচনারীতির আসল স্টাইল হচ্ছে, কথা বা কালামকে যথার্থ বাস্তবতা ও সময়ের আয়না বানাতে হবে। অতএব, এক্ষেত্রেও, 'রহমান'-কে 'রহীম' এর পূর্বে ব্যবহার করার অনুক্রমের মাধ্যমে এই কালামকে সঠিক বাস্তবতা এবং সময়ের আয়না বানানো হয়েছে। তাই এই স্বাভাবিক অন্বয় অনুক্রম বা তরতীব (Sequence)-এর বিস্তারিত আলোচনা এখন করা হবে সূরা ফাতিহার অন্যান্য আয়াত প্রসঙ্গে। *(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ. ৩৯২- ৪১৩, হাশিয়া–১১)।*

(৩৪)

সূরা ফাতিহার একটি আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব হচ্ছে, নামাযের মধ্যে এই সূরাকে অন্তরের সম্পূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে আবৃত্তি করলে এবং এর শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলে, অন্তরকে গভীরভাবে আলোকিত করে। অর্থাৎ এতে হৃদয় সম্প্রসারিত হয় এবং মানবীয়তার (বাশারিয়ত-এর)অন্ধকার দূরীভূত

হয়। এবং কৃপা ও কল্যাণের আধার-এর কল্যাণরাজি মানুষের উপরে বর্ষিত হওয়া শুরু হয়ে যায়। এবং ঐশী স্বীকৃতি বা কবুলিয়তে ইলাহীর আলোসমূহ তার উপরে পতিত হয়ে তাকে ঘিরে ফেলে। এমনকি, সে উন্নতি করতে করতে ঐশী সম্বোধন লাভের সম্পর্কে ভূষিত হয় এবং সত্য দিব্যদৃষ্টি (কাশ্‌ফ) এবং সুস্পষ্ট ঐশীবাণী বা ইল্‌হাম -এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করে। এবং ঐশী-সত্তার অর্থাৎ খোদাতায়ালার সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন এমন সব বিস্ময়কর প্রেরণা, নিঃসংশয় বাণী ও প্রার্থনার উত্তর প্রাপ্তি এবং অদৃশ বিষয়াদি সম্পর্কে কাশ্‌ফ বা দিব্যদৃষ্টি এবং ঐশী সাহায্য-সমর্থন তার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে যার কোন দৃষ্টান্ত অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা যদি বিরুদ্ধবাদীরা অস্বীকার করে, খুব সম্ভব তারা অস্বীকারই করবে, তো তাদের জন্য প্রমাণ দেওয়া আছে এই পুস্তকে। এই বিনীত ব্যক্তি প্রত্যেক সত্যান্বেষীকে পরিতুষ্ট করতে প্রস্তুত রয়েছে। এবং শুধু বিরুদ্ধবাদীদেরকেই নয় বরং যারা নামে মাত্র বা লোকাচার রক্ষার্থে আমাদের মতকে সমর্থন করে এবং যারা বাহ্যতঃ মুসলমান কিন্তু, একেবারে নিরীহ-নিস্পৃহ মুসলমান এবং নিষ্প্রাণ, যাদের এই অন্ধকার যুগে ঐশী নিদর্শনের প্রতি কোন বিশ্বাস নেই, এবং যারা ওহী ইলহাম বা ঐশীবাণীকে অসম্ভব বিষয় বলে মনে করে এবং মনে করে যে, এগুলি সবই অধ্যাস (Illusion) কল্পনাপ্রসূত, অন্তরের প্ররোচনা বা অন্তর্স্বর (Inner voice);যারা মানবীয় উন্নতি সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ধারণা পোষণ করে এবং তা শুধু বুদ্ধি -বৃত্তি ও ধ্যান-ধারণার গণ্ডীতেই আবদ্ধ বলে মনে করে, এবং অপরদিকে, খোদাতায়ালাকেও অত্যন্ত দুর্বল ও অথর্ব বলে মনে করে, --এদের সকলের খেদমতে এই বিনীত ব্যক্তি সবিনয়ে নিবেদন করছে যে, যদি এখনও পর্যন্ত কোরআনে প্রভাব ও কার্যকারিতার উপরে কারো অবিশ্বাস থেকে থাকে, এবং কেউ যদি পুরাতন অজ্ঞতাকেই আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে, তাহলে তাদের জন্য এটাই উত্তম সুযোগ যে, এই বিনীত খাদেম আপন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করবার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এজন্য, এটাই সমীচীন হবে যে, সত্যানুসন্ধানী হয়ে এই বিনীতের প্রতি রুজু করা বা ধাবিত হওয়া, এবং কালামে ইলাহী বা কোরআন করীমের যে সমস্ত বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে তা সবই নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করা। এবং অন্ধকার ও অজ্ঞতা থেকে বের হয়ে এসে নূরে হকীকি বা সত্যিকার আলোকের মধ্যে প্রবেশ করা। এখনও পর্যন্ত তো এই বিনীত জীবিত আছে, কিন্তু মাটির দেহের কী-ই বা ভিত্তি, আর কী-ই বা ভরসা এই নশ্বর পার্থিব জীবনের। অতএব, এটাই উচিত হবে যে, এই সাধারণ ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত এবং মিথ্যাকে বিলুপ্ত করার প্রতি মনোযোগী হওয়া। যদি এই অধমের দাবী সত্য প্রমাণিত না হয়, তাহলে অস্বীকার করবার কিংবা ঘাড় বাঁকা করে থাকবার একটা যুক্তি অন্ততঃ পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি এই বিনীতের কথার সত্যতা বাঞ্ছিত আকারে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে খোদাকে ভয় করে, মিথ্যা বা বাতিল চিন্তা- চেতনাকে পরিহার করে, ইসলাম এর সত্য পথ অবলম্বন করাই উচিত হবে। যাতে করে ইহজগতে লাঞ্ছনা আর অপমানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং পরজগতে শাস্তি ও যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। অতএব, দেখো! হে ভ্রাতাগণ! হে বন্ধুগণ! হে দার্শনিকগণ! হে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীগণ! আমি তো এখন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এবং ঘোষণা দিয়ে বলছি যে, যদি কারো কোন

সন্দেহ থাকে, এবং (কোরআন করীমের) উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহকে মেনে নিতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে সে যেন অবিলম্বে আমার কাছে আসে এবং ধৈর্য ও আন্তরিকতা সহকারে আমার সংগে থেকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর সত্যতা স্বচক্ষে দর্শন করে। পাছে এমন না হয় যে, এই অধম অতীত হয়ে গেলে কেউ অন্যায়ভাবে এই কথা বলে, কই কখন আমাকে খুলে বলা হলো, বললে তো আমি পরখ করেই দেখতাম! কই, কে কখন জিম্মাদারী নিয়ে দাবী করলো, করলে তো আমি তার কাছে তার দাবীর সত্যতার প্রমাণ চাইতাম! সুতরাং, হে ভাইয়েরা! হে সত্যের অনুসন্ধানকারীরা! এদিকে দেখো যে, এই অধম খোলাখুলিভাবেই বলছে যে, এবং তার নিজের সেই খোদা, যার আলোসমূহ সে দিনরাত দেখতে পাচ্ছে, তাঁরই উপরে ভরসা করে এই কথার জিম্মাদারী গ্রহণ করছে যে, তোমরা যদি পরিষ্কার মন নিয়ে পূর্ণ আন্তরিকভাবে সত্যের অনুসন্ধানী হও এবং ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা সহকারে কিছুদিন এই অধমের সংসর্গে অবস্থান কর, তাহলে একথা তোমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে যাবে যে, সত্যিসত্যিই ঐ সমস্ত আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যার বর্ণনা এখানে করা হয়েছে- তা সবই সূরা ফাতিহা ও কোরআন শরীফের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব কত ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে তার হৃদয়কে গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করে এবং ইসলাম কবুল করার জন্য আগ্রহী হয়ে, এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আন্তরিকতা ও আকাংখা নিয়ে এদিকে মনোনিবেশ করে। পক্ষান্তরে, কত হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যে এ ধরনের প্রকাশ্য ঘোষণা শোনার পরেও চোখ তুলে তাকায় না, এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে স্বজ্ঞানে খোদাতায়ালার অভিশাপ ও ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। মৃত্যু অতি নিকটে, জীবনের ক্ষণ তো শেষ হয়ে এসেছে।

(বারাহীনে অহ্‌মদীয়া, পৃ ৬০৪-৬১৩, পাদটীকা-১১)

(৩৫)

'সূরা আল্ ফাতিহা সংক্ষিপ্তকারে কোরআন শরীফের সমস্ত উদ্দেশ্যকে নিজের মধ্যে ধারণ করে আছে। সূরাটি যেন কোরআনী উদ্দেশ্যাবলীর সূক্ষ্ম অথচ সমগ্র মর্মবাণী এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন : وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

('এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে দান করেছি পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সপ্ত আয়াত ও মহান কোরআন।' *(১৫ ঃ ৮৮)*

অর্থাৎ আমরা তোমাকে হে রসূল! সূরা ফাতিহার সাত আয়াত দান করেছি যা সংক্ষিপ্তাকারে কোরআনের উদ্দেশ্যাবলীকে ধারণ করে আছে এবং এর মোকাবেলায় কোরআনে আযীমকেও দান করেছি যা বিস্তারিতভাবে ধর্মীয় সকল উদ্দেশ্যকে প্রকাশিত করে দিয়েছে। এ কারণেই এই সূরার নাম রাখা হয়েছে 'উম্মুল কিতাব' এবং 'সূরাতুল জামে" (গ্রন্থ জননী এবং ব্যাপক অধ্যায়), একে 'উম্মুল কিতাব' আখ্যা দান করা হয়েছে এই কারণে যে, এর মধ্য থেকেই কোরআনের সমস্ত উদ্দেশ্য নির্গত হয়, এবং একে সূরাতুল জামে' বলার তাৎপর্য হচ্ছে, এই সূরা কোরআনী সকল প্রকার জ্ঞান বা শিক্ষাকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। এ কারণেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেছে, সে যেন সারা কোরআনকেই পাঠ করেছে। সংক্ষেপে, কোরআন শরীফ ও নবী করীম (সাঃ)-এর

হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রশংসিত এই সূরা আল্ ফাতিহা কোরআন দর্শনের এক দর্পণ। এর তাৎপর্য হচ্ছে, কোরআন শরীফের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম যে উদ্দেশ্য আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ ও পারফেক্ট প্রশংসাসমূহের বর্ণনা করা, তা এর মধ্যে করা হয়েছে। এবং তাঁর (আল্লাহ্র) সত্তা যে পরিপূর্ণ সমগ্রতার অধিকারী তা-ও এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং, এই উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তাকারে সাধিত হয়েছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্'-এর মধ্যে। কেননা, এর অর্থ এটাই যে, সমস্ত পূর্ণ ও পারফেক্ট প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত, যিনি সকল প্রকার ঔৎকর্ষের একচ্ছত্র অধিকারী এবং সকল ইবাদতের একমাত্র যোগ্য, হক্‌দার।

কোরআন শরীফের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই গ্রন্থ খোদার সর্বোত্তম ও কামেল নির্মাতা হওয়াকে এবং বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা হওয়াকে প্রকাশিত করছে এবং বিশ্ব-জগতের সূচনার অবস্থা বর্ণনা করছে। এবং বিশ্ব-জগতের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত কিছুকেই সৃষ্ট বলে প্রমাণ করছে। এবং এই বিষয়টির যারা বিরোধী তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে। অতএব, এই উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'রাব্বিল আলা-মীন'-এর মধ্যে।

কোরআন শরীফের তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদাতায়ালার প্রদত্ত অনর্জিত ও অযাচিত কৃপারাজিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এবং তাঁর আম বা সাধারণ রহমত এর বিবরণ দেওয়া। এবং এই উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে اَلرَّحْمٰنِ 'রহমান' শব্দের মধ্যে।

চতুর্থ উদ্দেশ্য কোরআন শরীফের এই যে, খোদাতায়ালার সেই সমস্ত কৃপারাজি প্রতিষ্ঠিত করা যা পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে اَلرَّحِيْمِ 'রহীম' শব্দের মধ্যে।

পঞ্চতম উদ্দেশ্য কোরআন শরীফের যা, যা হচ্ছে, পরজগতের সত্যতা বর্ণনা করা। এবং এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'-এর মধ্যে।

কোরআন শরীফের ষষ্ঠ উদ্দেশ্য হচ্ছে, আন্তরিকতা এবং দাসত্ব (উবুদিয়ত) এবং গায়ের-আল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু) থেকে আত্মার পবিত্রতা সাধন এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা এবং চারিত্রিক সংশোধন এবং ইবাদতের মধ্যে তৌহীদ সম্পর্কিত বর্ণনা দান করা; এবং এই উদ্দেশ্যের কথা সংক্ষেপে এসে গেছে اِيَّاكَ نَعْبُدُ 'ইয়াকা না' বুদু -এর মধ্যে।

কোরআন শরীফের সপ্তম উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিটি কর্মের আসল কর্তা যে খোদা তা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সকল শক্তি-সামর্থ্য ও কৃপা-করুণাএবং সকল সাহায্য-সহায়তা ও সবর-সহিষ্ণুতা এবং পূর্ণ আনুগত্য এবং পাপ থেকে নিষ্কৃতি এবং সৎ-কর্মের সকল উপায়- অবলম্বন এবং দুনিয়া ও দ্বীনের মঙ্গল প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনায় জোর দেওয়া। এই উদ্দেশ্যের বর্ণনা সংক্ষেপে এসে গেছে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'ইয়াকা নাস্তাঈন' এর মধ্যে।

কোরআন করীমের অষ্টম উদ্দেশ্য হচ্ছে, সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল-সুদৃঢ় পথ -এর সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করা এবং তার অনুসন্ধানের জন্য তাগাদা দেওয়া যেন প্রার্থনা ও বিনয় সহকারে লোকে তার অনুসন্ধান করে। এই উদ্দেশ্যের কথা সংক্ষেপে এসেছে
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'এহ্দেনাস সেরাতাল মুস্তাকীম'-এর মধ্যে।

কোরআন শরীফের নবম উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ সকল মানুষের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া যাঁদের উপরে খোদাতায়ালার এনআম বা পুরস্কার এবং কৃপা ও কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে, যাতে করে সত্যান্বেষীগণের হৃদয় প্রশান্তি পেতে পারে। এই উদ্দেশ্যের কথা এসে গেছে صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 'সেরাতাল্লাযীনা আন্ আমতা আলায়হিম'এর মধ্যে।

কোরআন শরীফের দশম উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সমস্ত লোকের পথ ও পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া যাদের উপরে খোদার ক্রোধ বা গযব বর্ষিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে সকল প্রকার বেদাত-এর মধ্যে পতিত হয়েছে, যাতে করে সত্যান্বেষীরা তাদের রাস্তা সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে। এই উদ্দেশ্যের কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ 'গায়রিল মুগযুবে আলায়হিম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন' এর মধ্যে।

এই হচ্ছে সেই দশটি উদ্দেশ্য যেগুলির কথা বলা হয়েছে কোরআন শরীফে, যা কিনা যাবতীয় সত্যতার মূল। এবং এই সমস্ত উদ্দেশ্যই বর্ণিত হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে সূরা আল্ ফাতিহার মধ্যে।' *(বারাহীনে আহ্মদীয়া, পৃ. ৫৫৮–৫৬৩, পাদটীকা–১১)*

(৩৬)

স্মর্তব্য যে, যারা শুধু আকল্ বা যুক্তির উপরেই নির্ভরশীল তারা যেমন জ্ঞান ও মারেফত ও ইয়াকীন বা দৃঢ়-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অপূর্ণ, তেমনি কর্ম ও বিশ্বস্ততা ও সততার ক্ষেত্রেও ক্রটিপূর্ণ এবং অপূর্ণ। এবং তাদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় এমন কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি যা থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে যে, তারাও ঐ সকল লক্ষ লক্ষ পবিত্র ব্যক্তিগণের মতই খোদাতায়ালার বিশ্বস্ত এবং গৃহীত বা মকবুল বান্দা। যাঁদের কল্যাণরাজি এমনভাবে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁদের ওয়ায ও নসিহত ও দোয়া তাওয়াজ্জুহ্ বা মনোনিবেশ এবং সংসর্গের প্রভাবে শত শত লোক পবিত্র, আলোকিত এবং খোদা প্রদত্ত হয়েছে; এবং আপন মওলা বা প্রভুর প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে গেছে যে, দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত কোন কিছুরই কোন পরওয়া করেনি। এবং এই দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ, সুখ-শান্তি, খুশী-আনন্দ, খ্যাতি-প্রসিদ্ধি, গর্ব-গৌরব এবং মাল-সম্পদ ও রাজত্ব রাজ্যশাসন থেকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি ফিরায়ে নিয়ে এই সত্যতার রাস্তায় অগ্রসর হয়েছে যে পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে তাদের মধ্য থেকে শত শত লোক মৃত্যুবরণ করেছে, হাজার হাজার লোকের শিরচ্ছেদ করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পবিত্র মানুষের রক্তে ভূপৃষ্ঠ সিক্ত হয়েছে। শত দুঃখ-বেদনা সত্ত্বেও তাঁরা এমন বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন যে, আত্মহারা প্রেমিকের মত পায়ে শৃঙ্খল পরা অবস্থায় হাসিমুখে ও খুশীমনে সেই দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন, বিপদে-আপদে পতিত হয়েও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। এবং সেই 'এক'-এর প্রেমে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। সম্মানের পরিবর্তে অসম্মানকে বরণ করে নিয়েছেন। আরামের পরিবর্তে দুঃখ-মুসিবতকে মাথা পেতে নিয়েছেন, ঐশ্বর্যের পরিবর্তে দারিদ্র্য বরণ করেছেন। প্রত্যেক প্রকারের আত্মীয়তা

ও সমিতি-সংগঠন ও আনন্দ-উল্লাস পরিহার করে গরীবি ও নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করে নিজেদের মস্তক কর্তন করতে দিয়ে এবং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বিনিময়ে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের (সত্যতার) উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এবং কালামে ইলাহী অর্থাৎ কোরআন শরীফের পূর্ণ অনুবর্তিতার কল্যাণে তাঁদের মধ্যে সেইসব বিশেষ আলো সৃষ্টি হয়েছিল যা অন্যদের মধ্যে কখনই পরিদৃষ্ট হয়নি। এবং এই শ্রেণীর লোক শুধু যে প্রথম যুগেই বিদ্যমান ছিলেন, তা নয়, বরং এই মনোনীত ব্যক্তিদের জামাত সব সময়েই ইসলামের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং সব সময়েই নিজেদের নূরানী বা আলোময় সত্তা দ্বারা নিজেদের বিরুদ্ধবাদীদেরকে অপরাধী এবং লা-জওয়াব করে দিচ্ছে। সুতরাং, অবিশ্বাসকারীদের প্রতি আমাদের এই যুক্তি-প্রমাণ বা হুজ্জতকেও পূর্ণরূপে পেশ করা হয়েছে যে, কোরআন শরীফ যেভাবে কাউকে জ্ঞানবুদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে, তেমনি তা জ্ঞানবুদ্ধির স্তরকেও পূর্ণ পরিণতি দান করে, এবং তারই মাধ্যমে সেই জ্ঞানবুদ্ধি অর্জন করা যায়। খোদা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার বা কবুলিয়তের চিহ্ন ও আলোসমূহ কেবল সেই সমস্ত লোকের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যাঁরা এই পবিত্র কালামের আনুগত্য অবলম্বন করেছেন। অন্যদের মধ্যে তা (কবুলিয়তের চিহ্ন ও আলো) কখনই প্রকাশিত হয় না। অতএব, সত্যান্বেষীর জন্য এই প্রমাণই যথেষ্ট যা সে স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারে। অর্থাৎ, এই যে স্বর্গীয় কল্যাণরাজি এবং ঐশী চিহ্নসমূহ যা শুধু কোরআন শরীফের পূর্ণ আনুগত্যকারীদের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা কখনই অন্য কোন ফের্কা বা সম্প্রদায় যারা এই সত্য ও পবিত্র কালাম থেকে মুখ ফেরায়ে রাখে তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না, তা সেই সম্প্রদায় ব্রাহ্ম, আর্য, খৃষ্টান যা-ই হোক না কেন। তারা এই সত্যতার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যা হোক এ ব্যাপারে প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা জিম্মা গ্রহণ করছি, তবে শর্ত এই যে, সে পরিষ্কার মন নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থেকে, সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসে দৃঢ়তা, ধৈর্য ও আন্তরিকতাসহ সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কষ্ট করে এদিকে আসবে।'

(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ. ৩২৮–৩৩০, পাদটীকা–১১)

(৩৭)

'কোরআন শরীফে যেসব কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কেচ্ছা-কাহিনী নয়। বরং, সেগুলি কেচ্ছা-কাহিনীর আকারে লিখিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী। হ্যাঁ, তৌরিতে যেগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি কেচ্ছা-কাহিনীই বটে, কিন্তু কোরআন শরীফ প্রত্যেকটি কাহিনীকেই হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর রূপ দান করেছে। এবং এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হয়েছে। সংক্ষেপে কোরআন শরীফ মারেফত ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের এক মহা সমুদ্র। এবং ভবিষ্যদ্বাণীরও এক সমুদ্র। এটা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় যে, সে কোরআন শরীফের মাধ্যম ব্যতিরেকে খোদাতায়ালার উপরে পূর্ণ ঈমান আনে। কেননা, এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে কোরআন শরীফের মধ্যেই নিহিত যে, এর পূর্ণ অনুবর্তিতার ফলশ্রুতিতে সেইসব পর্দা অপসারিত হয়ে যায় যা মানুষ এবং খোদার মধ্যখানে বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী শুধু কাহিনীর আকারেই খোদার নাম নিয়ে থাকে।

কিন্তু, কোরআন শরীফ ঐ প্রকৃত প্রিয়তম বন্ধুর–মাহ্বুবে হকীকির চেহারা প্রদর্শন করে। এবং দৃঢ় বিশ্বাস বা ইয়াকীনের আলো মানব হৃদয়ে প্রবিষ্ট করে দেয়। এবং সেই যে খোদা যিনি সারা জগতের কাছে গোপন রয়েছেন, তিনি কোরআন শরীফের মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শন করেন।' *(চশ্মা মারেফত, পৃ. ২৫৯–৬০)*

(৩৮)

'কোরআন শরীফ শুধু তার অনবদ্য ভাষারীতি ও রচনাশৈলীর সৌন্দর্যের দিক থেকেই অতুলনীয় নয়, বরং তার সেই সমস্ত সৌন্দর্যের দিক থেকেও অতুলনীয় যে সমস্ত সৌন্দর্যের আধার বলে সে নিজেকে দাবী করে, এবং এটাই আসল সত্য। কেননা, খোদাতায়ালার কাছ থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা শুধু এক প্রকারের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেই অতুলনীয় হয় না, বরং তা সৌন্দর্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতুলনীয় হয়। সন্দেহ নেই যে, যারা মারেফত ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোরআন শরীফকে অসীম ও অন্তহীন মনে করে না, তারা কোরআনের মূল্যায়ন বা কদর সেইভাবে করতে পারে না, যেভাবে তার কদর করা উচিত। খোদাতায়ালার পবিত্র ও সত্য কালামকে সনাক্ত করবার জন্য একটি প্রয়োজনীয় নির্দেশন হচ্ছে, এর সমস্ত গুণাবলীই অনন্য। কেননা, আমরা দেখতে পাই যে, কোন জিনিস যা খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে এসেছে তা সে একটা বার্লির দানাই হোক না কেন, তা তুলনাবিহীন। মানবীয় শক্তি তার মোকাবেলা করতে অক্ষম। আর তুলনাহীন হওয়াই তো সীমাহীন হওয়া। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি বস্তু সেই অবস্থায় তুলনাবিহীন প্রতিপন্ন হবে, যে অবস্থায় তার সব বিস্ময় বা রহস্যাবলীর ও তার গুণাবলীর কোন সীমা-সরহদ নযরে আসবে না। এবং আমরা বলে এসেছি যে, এই বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায় খোদাতায়ালার প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একটি গাছের পাতার বিস্ময়াবলীর (Wonders) উপরে হাজার বছর ধরেও গবেষণা চালানো যায়, তবে সেই হাজার বছর শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু সেই পাতার বিস্ময়কর রহস্যাবলী শেষ হবে না। মোদ্দাকথা, যে জিনিস সীমাহীন ক্ষমতা বা কুদরত থেকে অস্তিত্ব লাভ করে, তার মধ্যে সীমাহীন রহস্য, বিস্ময় এবং গুণাবলী সৃষ্টি হওয়াও একান্ত আবশ্যক। এবং এই বিষয়টিকেই সমর্থন করছে নিম্নোক্ত আয়াতটি, যেখানে বলা হয়েছে :

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝۱۱۰

('তুমি বল 'যদি সমুদ্র আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাক্যসমূহের জন্য কালি হয়ে যায়, তথাপি আমার প্রভু-প্রতিপালকের বাক্যসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্রই নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমরা তার সমপরিমাণ (সমুদ্র) আরও এনে দিই' *(১৮ : ১১০)।*

কেননা সমগ্র সৃষ্টিই, রূপকার্থে, আল্লাহ্র কথা–কলেমাতুল্লাহ্। ....। সুতরাং, এই অর্থ অনুযায়ী এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটাই যে, সমগ্র সৃষ্টির গুণাবলী অসীম ও অন্তহীন। এবং যখন প্রত্যেকটি সৃষ্টির গুণাবলী অসীম ও অন্তহীন, এবং প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেই অন্তহীন রহস্যাবলী নিহিত, তখন কী করে কোরআন করীম–যা কিনা খোদাতায়ালার পবিত্র বাক্য–তা মাত্র কয়েকটি অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে? এবং যার ভাষ্য বা তফসীর পঞ্চাশ কিংবা ধরুন, হাজার ভল্যুমের মধ্যেই লিখে শেষ করা যাবে? কিংবা একটা সীমিত যামানার মধ্যেই তার সবটাই বর্ণনা করে দিয়ে গেছেন আমাদের নেতা ও প্রভু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম? অবশ্য, এই ধরনের কথা মুখে

আনাটাও আমার নিকটে অবিশ্বাস বা কুফরীর কাছাকাছি, আর যদি এর উপরে জোর দেওয়া হয়, তাহলে তো কুফরী হয়ে যাওয়ারই আশঙ্কা দেখা দিবে। এ তো ঠিক যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম কোরআন করীমের যে অর্থ ও তাৎপর্য বয়ান করে গেছেন তা-ই সহীহ্ এবং সত্য। কিন্তু, এটা কিছুতেই ঠিক নয় যে, কোরআন করীমের যে জ্ঞান আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে গেছেন তার চাইতে বেশী কিছু আর কোরআন করীমে নেই। এমন কথা তো আমাদের সেই বিরুদ্ধবাদীর পক্ষেই পরিষ্কার প্রমাণস্বরূপ হয়ে যাবে, যারা কোরআন করীমের রহস্যাবলী, মাহাত্ম্য এবং গুণাবলীকে সীমাহীন বলে স্বীকার করে না। তাদের এই কথা বলা যে, কোরআন করীম কেবল তাদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিল যারা উম্মী বা অশিক্ষিত ছিল, প্রমাণ করে যে, তারা কোরআন করীমের স্বীকৃতি দানের অন্তর্দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এবং তারা এটাও অনুধাবন করতে অক্ষম যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামকে কেবলমাত্র উম্মীদের জন্যই প্রেরণ করা হয়নি, বরং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক জাতির মানুষেরা তাঁর (সাঃ) উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেছেন : قُلْ يَآيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

('তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের সকলের প্রতি। -৭ঃ১৫৯)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন করীম প্রত্যেকটি যোগ্যতাকে পূর্ণতা দানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে আয়াত وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ! 'কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর, *(৩৩ঃ৪১)* এই দিকেই ইঙ্গিত করছে। অতএব, এই যে ধারণা, কোরআন করীম সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম যা বলে গেছেন তা-ই সব, তার চেয়ে বেশী আর কিছু বলা সম্ভব নয়, তা স্পষ্টতঃই মিথ্যা। আমরা অকাট্য ও সুনিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছি যে, খোদাতায়ালার কালামের জন্য এটা জরুরী যে, তার বিস্ময়কর রহস্যাবলী হবে সীমাহীন ও তুলনাহীন। এবং যদি এই আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, যদি কোরআন করীমের মধ্যে এই ধরনের বিস্ময়কর রহস্যাবলী এবং গুণাবলী গুপ্ত থেকেই থাকে, তাহলে পূর্ববর্তীদের কী অপরাধ ছিল যে, তাদেরকে এই সমস্ত রহস্যাবলী থেকে বঞ্চিত রাখা হলো। তাহলে এর জবাব হচ্ছে এই যে, তারা কোরআনের সব রহস্যাবলী থেকে তো বঞ্চিত ছিল না, বরং তাদের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের যতটা উপলব্ধি খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে উত্তম বিবেচিত হয়েছিল তাদেরকে ততটাই দান করা হয়েছিল। এবং সেই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সে যুগেই যতটা রহস্য প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তা সেই যুগে প্রকাশিত করা হয়েছিল। কিন্তু যা ঈমানের ভিত্তি, যা কবুল করলে এবং জানলে কোন ব্যক্তি মুসলমান বলে দাবী করতে পারে, তা সর্বযুগেই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, এই সমস্ত নির্বোধ মৌলবী কোথায় কার কাছে শুনেছে যে, খোদাতায়ালার জন্য এটা বাধ্যকর যে, যা কিছু কৃপা-কল্যাণ ও দান-এনআম সেই মহিমাময় স্রষ্টার পক্ষ থেকে অনাগত ভবিষ্যতে প্রকাশিত হতে থাকবে, তা সবকিছুরই প্রকাশ প্রমাণিত হতে হবে অতীত থেকেও!

(কেরামাতুস সাদেকীন, পৃ.১৮-২০)।

'জানা দরকার যে, (কোরআন শরীফের) সহীহ্ তফ্সীর বা সত্যিকার ভাষ্যের সর্বপ্রথম মানদন্ড হচ্ছে স্বয়ং কোরআনের সাক্ষ্য। একথা গভীর অভিনিবেশ সহকারে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোরআন করীম অন্যসব মামুলী গ্রন্থের মত নয়, যেগুলি নিজেদের সত্যতার প্রমাণের বা উদ্ঘাটনের জন্য অন্যকিছুর মুখাপেক্ষী। এ এমন এক সুনির্মিত সৌধের ন্যায় যার একটা ইট স্থানচ্যুত হলেই সারাটা সৌধের অবয়বে বিকৃতি ঘটবে। এর কোন সত্যতাই এমন নয় যে, যার পক্ষে অন্তত দশ/বিশটা সাক্ষ্য স্বয়ং এর মধ্যেই বিদ্যমান নেই। সুতরাং আমরা যদি কোরআন করীমের কোন এক আয়াতের একটা অর্থ করি, তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে, সেই অর্থের সত্যায়নের জন্য কোন সাক্ষ্য কোরআন করীমের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা। যদি কোন সাক্ষ্য পাওয়া না যায়, বরং যদি দেখা যায় যে, আমাদের গৃহীত অর্থ অন্যান্য আয়াতের বিরুদ্ধেই চলে গেছে, তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে, আমাদের সেই অর্থ সঠিক হয়নি। কেননা, এটা সম্ভবই নয় যে, কোরআন করীমের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকবে। এবং সঠিক অর্থের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, কোরআন করীমের মধ্য থেকেই একদল সাক্ষী তার সমর্থন করবে প্রত্যক্ষরূপে।

দ্বিতীয় মানদণ্ড হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের তফ্সীর। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, কোরআন করীমের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সমঝদার ও ভাষ্যকার ছিলেন আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম। সুতরাং কোন তফসীর সম্পর্কে যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তা করেছেন স্বয়ং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই এটা ফরয যে, সে স্বতস্ফূর্তভাবে এবং নির্দ্বিধায় সেই তফসীরকে মেনে নিবে। অন্যথায়, সে দ্রোহের এবং দার্শনিকীকরণের দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে।

তৃতীয় মানদণ্ড হচ্ছে, সাহাবীগণের তফ্সীর, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবা রাযিআল্লাহো আনহুম আঁ হযরত (সাঃ)-এর নূর বা আলো এবং ইল্‌মে নবুওয়ত বা নবুওয়তের জ্ঞান লাভ করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উত্তরাধিকারী ছিলেন। এবং খোদাতায়ালার অপার অনুগ্রহ ছিল তাঁদের (রাঃ) উপরে। এবং তাঁদের উপলব্ধির শক্তির প্রতি ছিল ঐশী সাহায্য। কেননা, তাঁরা শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি, কাজেও দেখিয়েছেন।

চতুর্থ মানদণ্ড হচ্ছে. পবিত্র নফ্স বা হৃদয় নিয়ে কোরআন করীমের উপরে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা, পবিত্র নফ্সের সঙ্গে কোরআনে করীমের সম্পর্ক বিদ্যমান। আল্লা জাল্লা শানুহু বলেছেন : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ('পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করবে না'–৫৬ : ৮০) অর্থাৎ, কোরআন করীমের সত্যতা কেবল তাদেরই নিকটে উন্মোচিত হয় যাদের হৃদয় পবিত্র। কেননা, মানুষের পবিত্র হৃদয়ের উপরেই কোরআন করীমের পবিত্র মারেফত বা নিগূঢ় জ্ঞান তার সম্পর্কের কারণেই প্রকাশিত হয় এবং সে তা সনাক্ত করে ও তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে। তখন তার হৃদয় স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠে, হ্যাঁ এটাই সত্য পথ। কেননা, তার হৃদয়ের আলোই সত্য যাচাইয়ের এক উত্তম মানদণ্ড। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অনুশীলনের মাধ্যমে পবিত্র হবে না অর্থাৎ 'সাহেবে হাল' হবে না,

এবং সেই সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করবে না, যে পথ অতিক্রম করে গেছেন আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম, সে পর্যন্ত তার উচিত হবে, গোস্তাখী ও তাকাব্বরী (অনধিকার চর্চা ও অহংকার) করে কোরআনের ভাষ্যকার হয়ে না যাওয়া। অন্যথায় তার ভাষ্য বা তফসীর হবে তার মনগড়া যা করতে বারণ করেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইয়হে ওয়াসাল্লাম। তিনি (সাঃ) বলেছেন : من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের মত বা ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী কোরআন করীমের তফ্সীর করে এবং মনে করে যে, সে সঠিক তফ্সীরই করেছে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সে নিকৃষ্ট তফ্সীর করেছে।

পঞ্চম মানদণ্ড হচ্ছে, আরবী অভিধান। কিন্তু, কোরআন করীম স্বয়ং (তার তফ্সীরের জন্য) এত বেশী উপায় ও মাধ্যম দিয়ে রেখেছে যে, আরবী ভাষার অভিধানগুলোর সাহায্য নেয়ার বড় একটা প্রয়োজন পড়ে না। তবে হ্যাঁ, সন্দেহ নেই যে, এর দ্বারা জ্ঞানের পরিসর প্রশস্ত হতে পারে। বরং কোন কোন সময় কোরআন করীমের কোন রহস্য উদ্ঘাটনে অভিধানের সাহায্য নিলে মনোযোগ গভীরতর হয়, ফলে রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায়।

ষষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে, রূহানী সিলসিলা বা আধ্যাত্মিক পদ্ধতিকে অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন হয় জেসমানী সিলসিলা বা দৈহিক পদ্ধতির। কেননা, এই উভয় সিলসিলার মধ্যে একটা পূর্ণ সাযুজ্য রয়েছে।

সপ্তম মানদণ্ড হলো, ওলীআল্লাহ্গণের ওহী-ইল্হাম বা ঐশীবাণী এবং মুহাদ্দেসীনের কাশ্ফ বা দিব্যদর্শন। এবং এই মানদণ্ডেরই আওতাভুক্ত অন্যসব মানদণ্ড। কেননা, ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর নবীর–যাঁর আনুগত্য তিনি করেন–তাঁর পূর্ণ প্রতিবিম্ব। এবং নবুওয়ত ও নতুন আদেশাবলী ব্যতীত বাকী সেইসব কিছুই তাঁকে দান করা হয়, যা দান করা হয় নবীকে। এবং সুনিশ্চিতরূপে তাঁর উপরে প্রকৃত শিক্ষা প্রকাশ করা হয়। শুধু এতটুকুই নয়, বরং তাঁর উপর সেই সমস্ত বিষয়াদিও এনআম ও আকরামস্বরূপ (পুরস্কার ও সম্মানস্বরূপ) দান করা হয়, যা দান করা হয় তাঁর নবীকে যাঁর আনুগত্য তিনি করেন। কাজেই, তাঁর প্রদত্ত বর্ণনা স্রেফ অনুমানভিত্তিক নয়, বরং তিনি দেখেই বলেন এবং শুনেই প্রকাশ করেন। এবং এই পথ এই উম্মতের জন্য উন্মুক্তই রয়েছে, এটা কখনই হতে পারে না যে, প্রকৃত উত্তরাধিকারী কেউ থাকবেন না।' *(বারাকাতুদ্দোয়া, পৃ. ১৭–২১)।*

(৪০)

'একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইলাহী কালাম বা আল্লাহ্র কথার কোন আয়াতের পাঠের বা অনুক্রমের মধ্যে কোন প্রকারের কোন পরিবর্তন বা রদবদল করবার কোন অনুমতি আমাদেরকে দেওয়া হয়নি, কেবল সেইভাবে ছাড়া যেভাবে করেছেন স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম। এবং এটাও প্রমাণিত হতে হবে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সেই পরিবর্তন সাধন করেছেন; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রমাণিত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোরআন করীমের পাঠ ও অনুক্রম

(Text & Sequence)-এর মধ্যে কোন ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন করতে পারবো না, এবং এর সাথে আমাদের পক্ষ থেকে নতুন কোন কথা যোগ করতেও পারবো না। এমনটা করলে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবো এবং এজন্য আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।'

(ইত্‌মামুল হুজ্জা, পৃ.১৯)।

(৪১)

'এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, কোরআন করীমের মধ্যে মুফরাদাত-এর অর্থাৎ মূলশব্দ ও শব্দমূল ব্যবহারের দশ প্রকার পদ্ধতি রয়েছে :

১. প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে তা-ই, যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা এবং স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণের কথা। এবং সেই সঙ্গে খোদাতায়ালার এমন সব গুণাবলী, নামসমূহ, কর্মকাণ্ড এবং পথ ও পদ্ধতি ও অভ্যাসের বর্ণনা যা পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যসহ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সত্তার জন্য বিশিষ্ট বা খাসভাবে নির্দিষ্ট। এছাড়া, এই পদ্ধতির মধ্যে সেই সমস্ত কথা বা কালেমাতও অন্তর্ভুক্ত, যা তাঁর সর্বোত্তম প্রশংসা স্তুতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তাঁর গৌরব, সৌন্দর্য এবং মহত্ত্বের কথা।
২. দ্বিতীয় পদ্ধতির আওতায় বর্ণিত হয়েছে স্রষ্টার তৌহীদ বা একত্বের কথা এবং সেই তৌহীদের স্বপক্ষে প্রদত্ত যুক্তি ও প্রমাণ।
৩. তৃতীয় হচ্ছে সেই পদ্ধতি যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে বান্দার সেই সমস্ত গুণাবলী, কার্যাবলী, আচরণ, অভ্যাস এবং রূহানী ও নাফ্‌সানী (আধ্যাত্মিক ও প্রবৃত্তিগত) অবস্থাসমূহের কথা যা সবই পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য সহ খোদাতায়ালার সমীপে তাঁর ইচ্ছানুসারে কিংবা ইহার বিরুদ্ধে বান্দাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বা প্রকাশিত হয়।
৪. চতুর্থ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে প্রদত্ত কামেল বা পরিপূর্ণ হেদায়াতের কথা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উপদেশের কথা, নৈতিক শিক্ষার কথা, আকায়েদ বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা, হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল এবাদ (আল্লাহ্‌র প্রতি হক এবং বান্দার প্রতি হক)-এর কথা। আরও রয়েছে, গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা, আইনগত সীমা বা হদুদ এবং হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধের কথা, যা সবই বর্ণিত হয়েছে সত্যতা ও মারেফতের ভিত্তিতে।
৫. পঞ্চম পদ্ধতির মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে,–নাজাতে হকীকি বা প্রকৃত পরিত্রাণ কি জিনিস, এবং তা লাভের জন্য প্রকৃত মাধ্যম এবং পন্থাই বা কী। এবং নাজাতপ্রাপ্ত মুমিনদের বা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবস্থা কী এবং তাদের আলামত বা চিহ্ন-ই বা কী।
৬. ষষ্ঠ পদ্ধতির মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইসলাম কী জিনিষ, এবং কুফরী ও শির্‌ক (অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতা) কী জিনিষ। এছাড়া, এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের সত্যতার উপরে যুক্তি-প্রমাণ এবং সকল প্রকার আপত্তি খন্ডন।
৭. সপ্তম পদ্ধতি দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত মিথ্যা মতবাদসমূহের খন্ডন করা হয়েছে।
৮. অষ্টম পদ্ধতির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সতর্কবাণী ও শুভ সংবাদ, প্রতিশ্রুতি ও বাধা নিষেধ, এবং পরকালের কথা। এই সব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে মোজেযার আকারে কিংবা দৃষ্টান্তের আকারে, কিংবা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে যা সবই ঈমানবর্ধক ও

সংশোধনে সহায়ক; এবং তা এমন সব কেচ্ছা-কাহিনীর আকারেও বলা হয়েছে যার মাধ্যমে তম্বী করা, সতর্ক করা, সুসংবাদ দান করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

৯. নবম পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবনীর কথা এবং তাঁর পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলীর কথা। এর মধ্যে রয়েছে আঁ হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র জিন্দেগীর উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্তের বর্ণনা। রয়েছে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলয়হে ও সাল্লামের নবুওয়তের পূর্ণ ও শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণের কথা।

১০. দশম পদ্ধতির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে কোরআন করীমের গুণাবলী এবং কার্যকারিতা, এবং তার বিশেষ বা খাস বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা।

এই দশ প্রকার পদ্ধতি যা কোরআন করীমে পূর্ণ পরিণত বা সমগ্র আকারে পাওয়া যায় তা দশটি বৃত্তের ন্যায়। একে বৃত্ত দশক বলেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই দশটি বৃত্তের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন করীমে এমন সব খাঁটি ও স্বতন্ত্র শব্দ ও শব্দমূলের ব্যবহার করেছেন যা লক্ষ্য করে সুস্থ বুদ্ধি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষ্যদান করে যে, শব্দ ও শব্দমূল ব্যবহারের এই পদ্ধতি আরবী ভাষায় এজন্যই রাখা হয়েছে যে, এতে করে যেন তা কোরআনের খেদমত করতে পারে। এ কারণেই শব্দ ও শব্দমূল (System of roots)-এর এই পদ্ধতি কোরআন করীমের শিক্ষার পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং এই শিক্ষা পদ্ধতিও সম্পূর্ণ, সর্বোত্তম। কিন্তু অন্যান্য কিতাবগুলির শব্দ ও শব্দমূলের ব্যবহার পদ্ধতি সেগুলির শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে কোনভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যদিও দাবী করা হয় যে, সেগুলিও ঐশী কিতাব এবং নাযিলও হয়েছে সেগুলির সেই ভাষাতেই। এবং উল্লিখিত বৃত্ত-দশকও সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। অতএব, ঐ সকল কিতাবের ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার এটাও একটা বড় প্রমাণ যে, সেগুলি ঐ প্রয়োজনীয় বৃত্ত দশক থেকে বঞ্চিত। এছাড়া, সেগুলির ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতিও সেই কিতাবগুলির শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে পারে নি। এবং এর মধ্যে ভেদ এটাই যে, ঐ কিতাবগুলো আসলে সত্য কিতাব ছিল না। বরং সেগুলি মাত্র কিছু দিনের জন্য কাজে এসেছিল। সত্যিকারের গ্রন্থ বা হকীকি কিতাব দুনিয়াতে এসেছে মাত্র একটিই যা সর্বকালেই মানুষের জন্য কল্যাণময়। সুতরাং, তা অবতীর্ণ হয়েছে উক্ত বৃত্ত-দশক সহ। তাই তার শব্দ ও শব্দমূল ব্যবহার পদ্ধতি তার শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এবং তার বৃত্তদশকের প্রত্যেকটি বৃত্তই তার নিজস্ব স্বাভাবিক পরিমাণ ও মূল্যমানসহ তার শব্দ ও শব্দমূল ব্যবহার পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। যার মধ্যে ঐশী গুণাবলী প্রকাশের জন্য এবং তার চার প্রকারের ব্যাখ্যার জন্য আলাদা আলাদা শব্দাবলী সুনির্দিষ্ট করা আছে। এবং শিক্ষার প্রত্যেকটি বৃত্তের জন্য এক একটি শব্দ ও শব্দমূল ব্যবহার পদ্ধতিরও বৃত্ত বিদ্যমান রয়েছে।'

(মিনানুর রহমান, পৃঃ ২৫–২৭, পাদটীকা)

(৪২)

'যাহোক, আমার ধর্মীয় বিশ্বাস এটাই যে, কোরআন তার শিক্ষার ক্ষেত্রে কামেল (অর্থাৎ পূর্ণ ও পারফেক্ট) । এবং কোন সত্যতাই (সাদাকাত) তার বহির্ভূত নয়। কেননা, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেছেন : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

('আমরা এই পূর্ণ কিতাব তোমার উপরে অবতীর্ণ করেছি সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ....) ১৬:৯০।

অর্থাৎ আমরা তোমার উপরে এই কিতাব নাযিল করেছি যার মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিষের বর্ণনা রয়েছে। এবং তিনি আরও বলেছেন : مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

(আমরা এই কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দেইনি'.....৬ঃ৩৯) অর্থাৎ, আমরা কোন কিছুকেই এই কিতাবের বহির্ভূত রাখিনি। কিন্তু, সেই সঙ্গে আমি এই বিশ্বাসও রাখি যে, কোরআন করীম থেকে সমস্ত ধর্মীয় বিষয়াদি চয়ন করা ও নির্বাচন করা এবং ঐশী ইচ্ছানুসারে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া প্রত্যেক মুজতাহিদ ও মৌলবীর কাজ নয়, বরং এই কাজ খাসভাবে তাঁদেরই যাঁদেরকে নবুওয়ত ও মহান বেলায়েত-এর অনুরূপ ওহী-এ-ইলাহী বা ঐশীবাণী দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর লোক যারা ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয় না, তারা কোরআনী বিষয়াদির বা তত্ত্বসমূহের চয়ন, নির্বাচন ও সেগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যোগ্যতা রাখে না। একমাত্র সোজা রাস্তা হচ্ছে, কোরআন থেকে অনুরূপ চয়ন, নির্বাচন ও বিশ্লেষণের পরিবর্তে তারা নির্দ্বিধায় ঐ সমস্ত শিক্ষাকেই গ্রহণ করবে যা ঐতিহ্যগতভাবে পাওয়া গেছে। আর যাঁরা মহান বেলায়েত-এর ন্যায় ওহীর আলোকে আলোকিত তাঁরাই মুতাহ্হারুন অর্থাৎ পবিত্র ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের ব্যাপারে, নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্তায়ালার আদত বা নীতি এটাই যে, সময়ে সময়ে তিনি তাদের উপরে কোরআনের গুপ্ত সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী প্রকাশ করে থাকেন। এবং তাঁদের কাছে পরিষ্কার করে দেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম কখনই অতিরিক্ত কোন শিক্ষা দান করেননি, বরং সহীহ্ হাদীসসমূহের মধ্যে কোরআন করীমের নীতিসমূহ ও নির্দেশাবলীরই বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এই মারেফত প্রাপ্ত হলে তাদের নিকটে কোরআন করীমের অলৌকিকত্ব উন্মোচিত হয়। তাছাড়া, ঐ সমস্ত পরিষ্কার যুক্তিযুক্ত আয়াতের সত্যতাও তাঁদের উপরে সুপ্রকাশিত হয় যেগুলির মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন যে, কোন কিছুই কোরআন বহির্ভূত নয়।'

(আলহক্ক মুবাহিসা লুধিয়ানা, পৃঃ ৭৮—৭৯)।

(৪৩)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

('তিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল আবির্ভূত করেছেন, যে তাদের নিকটে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়।') ৬২ঃ৩।

এই আয়াতের সারকথা হচ্ছে, কোরআন করীমের প্রধান ফায়দা দু'টি, যা চেনাবার জন্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম আগমন করেছিলেন। ফুরকানের এক হিকমত হচ্ছে, কোরআনের মারেফত বা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী, দ্বিতীয় হচ্ছে, কোরআনের কার্যকারিতা যা আত্মাকে পবিত্র করে। এবং কোরআনের হেফাযত শুধু এতটুকুই নয় যে, একে খুব সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে। কেননা, এই কাজ তো প্রাথমিক যুগের ইহুদী এবং খৃষ্টানরাও করেছিলেন (তাদের ধর্ম গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে)। এমনকি তৌরীতের নোক্তা বা বিন্দুগুলি পর্যন্ত গুণে রাখা হতো। কাজেই, এক্ষেত্রে বাহ্যিক হেফাযত সহ কোরআনের ফায়দা ও কার্যকারিতার হেফাযতের কথাও বলা হয়েছে। এবং তা আল্লাহ্‌র রীতি বা সুন্নাতুল্লাহ্ অনুসারে তখনই হওয়া সম্ভব, যখন

সময়ে সময়ে, নায়েবে রসূল-এর আগমন হবে, যাঁর মধ্যে মজুদ থাকবে রেসালাতের তামাম নেয়ামত প্রতিবিম্বাকারে। এবং যাঁকে ঐ বরকতসমূহ সাকল্যই দান করা হবে যা দান করা হয় নবীদেরকে। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতেও এই মহান বিষয়দির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

'তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন, এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যা তিনি মনোনীত করেছেন তাদের জন্য; এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তা তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার এবাদত করবে, এবং কোন কিছুকেই আমার সঙ্গে শরীক করবে না। এবং এরপর যারা অস্বীকার করবে তারাই দুষ্কৃতকারী।') *—২৪ঃ৫৬।*

অতএব, প্রকৃত প্রস্তাবে, এই আয়াত আর একটি আয়াতেরও ব্যাখ্যাস্বরূপ, যেভাবে বলা হয়েছে : اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

['নিশ্চয় আমরাই এই যিক্‌র (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি, এবং নিশ্চয়ই আমরাই এর হেফাযতকারী।']*-১৫ঃ১০।* এবং একই সঙ্গে এখানে এই প্রশ্নেরও জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কি করে এবং কী ভাবে কোরআনের সংরক্ষণ করা হবে। কাজেই খোদাতায়ালা বলছেন যে, তিনি এই নবী করীম (সাঃ)-এর খলীফা সময়ে সময়ে পাঠাতে থাকবেন।' *(শাহাদাতুল কোরআন, পৃঃ ৪২-৪৩)*

(৪৪)

'সেই যে সুনিশ্চিত, সুদৃঢ় ও সহজ উপায়—যার মাধ্যমে কোন প্রকার কষ্ট এবং শ্রম এবং বাধা এবং সন্দেহ এবং সংশয় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াই সত্য নীতিসমূহ সেগুলির সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণাদিসহ, উপলব্ধি করা যায়, এবং সুনিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করা যায় তা হচ্ছে কোরআন শরীফ, এবং এ ছাড়া পৃথিবীতে এমন আর কোন গ্রন্থ নেই, কিংবা এমন আর কোন উপায় নেই যার মাধ্যমে আমাদের এই সুমহান উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।' *(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ৭৭)।*

(৪৫)

'হে ভদ্র মহোদয়গণ! এখন আমি সেই স্বতন্ত্র চিহ্নসমূহের কথা বর্ণনা করবো যা কোন ইলহামী কিতাব বা ঐশীগ্রন্থকে সনাক্ত করবার জন্য সুস্থ বুদ্ধি নির্ধারণ করেছে। এবং তা কেবল পাওয়া যায় খোদাতায়ালার পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফের মধ্যেই। এবং এই যুগের উপযোগী যে সমস্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ঐশী গ্রন্থের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়, তা অপরাপর গ্রন্থগুলিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। হতে পারে যে, ঐ গ্রন্থগুলির মধ্যে ঐ সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী প্রথম যুগে ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। যদিও আমরা, পূর্বে উল্লেখিত এক

যুক্তির কারণে, ঐগুলিকে ঐশী গ্রন্থ বলেই মনে করি, তবু ঐশী হওয়া সত্ত্বেও, সেগুলি বর্তমান যামানার অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে গেছে। সেগুলি এখন সেই শাহী কেল্লার ন্যায় যা এখন শূন্য পড়ে আছে এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। এবং সম্পদ ও সামরিক শক্তি সব কিছুই সেখান থেকে নিচিহ্ন হয়ে গেছে।'

(সংযুক্তি প্রবন্ধ ঃ চশমা মারেফত, পৃঃ ৩২)

(৪৬)

'ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্য থেকে কেউ যদি এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, কোরআন শরীফকে অন্য সমস্ত ঐশী গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উন্নত বলে সাব্যস্ত করলে, একথার অর্থ এই হবে যে, বাকী সমস্ত ঐশী গ্রন্থের মান নিম্নস্তরের। অথচ, এগুলি সবই একই খোদার কালাম। এর মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন মানের পার্থক্য কি করে সৃষ্টি হতে পারে? তাহলে, এর জবাব হচ্ছে সন্দেহ নেই যে, ঐশী বাণী (অবতীর্ণ হওয়ার) দৃষ্টিকোণ থেকে সকল গ্রন্থই সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বর্ণনার আধিক্য এবং ধর্মে পরিপূর্ণতা দানের প্রেক্ষিতে কোন কোনটি কোন কোনটির চাইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআন শরীফ অন্য সমস্ত গ্রন্থের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, কোরআন শরীফের মধ্যে ধর্মের পরিপূর্ণতা দানের বিষয়াদি যথা তৌহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর সমাধান এবং সর্বপ্রকারের শিরক বা অংশীবাদিতা উৎসাদন, এবং আধ্যাত্মিক বা রূহানী ব্যাধিসমূহের নিরাময় ব্যবস্থা, মিথ্যা ধর্মগুলিকে প্রত্যাখ্যানের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ এবং সত্য মতবাদসমূহের পক্ষে প্রমাণাদি প্রভৃতি যতটা সমগ্রভাবে ও জোরালোভাবে পেশ হয়েছে, ততটা অপর আর কোন গ্রন্থেই করা হয়নি।'–

–(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ৭৪, পাদটীকা–২)

(৪৭)

'পাদ্রীদের এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, তারা বলে কিনা কোরআন তৌহীদ এবং ধর্মীয়-আদেশ নিষেধের ব্যাপারে এমন নতুন কি দিয়েছে যা তৌরিতে ছিল না? দৃশ্যতঃ যে কোন মূর্খ তৌরিত দেখলে এই ধোঁকার মধ্যে পড়বে যে, তৌরিতের মধ্যে তৌহীদও আছে এবং এবাদতের আদেশাবলী ও হুকুকুল এবাদ বা বান্দার প্রতি হক্ক-এর কথাও আছে। অতঃপর এমন কোন্ নতুন জিনিষ আর আছে যার বর্ণনা কোরআনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে? কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তিই এই ধোঁকা খাবে, যে কালামে ইলাহী নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। প্রকাশ থাকে যে, ইলাহীয়ত বা ঐশী বিষয় সম্পর্কিত এমন অনেক ব্যাপার রয়েছে তৌরিতের মধ্যে যার নাম-নিশানাও নেই। বস্তুতঃ তৌরিতের মধ্যে তৌহীদের সূক্ষ্ম স্তরসমূহের উল্লেখ কোথাও নেই। কোরআন আমাদের উপরে প্রকাশিত করে দিয়েছে যে, তৌহীদ শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় যে, আমরা মূর্তি এবং মানুষ এবং জানোয়ার এবং বস্তু এবং গ্রহ-নক্ষত্র এবং শয়তান-এর উপাসনা থেকে বিরত থাকবো, বরং **তৌহীদের তিনটি স্তর আছে।**

১. প্রথম স্তরের তৌহীদ হচ্ছে সাধারণের জন্য, অর্থাৎ সেই সব মানুষের জন্য যারা খোদাতায়ালার ক্রোধ বা গযব থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়;

২. দ্বিতীয় স্তরের তৌহীদ হচ্ছে অসাধারণের জন্য, অর্থাৎ যারা সাধারণের চাইতে অধিক ঐশী সান্নিধ্য লাভের বৈশিষ্ট্যের প্রত্যাশী; এবং
৩. তৃতীয় স্তরের তৌহীদ হচ্ছে অসাধারণের মধ্যেও অসাধারণের জন্য, অর্থ্যাৎ যারা একেবারে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌছাতে চায়।

তৌহীদের প্রথম স্তরে হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর উপাসনা যেন করা না হয়, এবং প্রত্যেকটি জিনিষ যা সীমিত ও সৃষ্টি বলে মনে হবে, তা সে যমীনেই হোক আর আসমানেই হোক তার উপাসনা থেকে যেন দূরে থাকা হয়।

তৌহীদের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, নিজের এবং অপরের সমস্ত কাজেকর্মে আসল শক্তি খোদাতায়ালাকেই জানা, এবং উপায়-উপকরণের উপর এতটা জোর না দেওয়া যাতে সেগুলোকে খোদাতায়ালার শরীক মনে হতে পারে; যেমন–একথা বলা যে, যায়েদ না হলে আমার এই ক্ষতি হয়ে যেতো, কিংবা বকর না হলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। যদি এই জাতীয় কথা এইরূপ নিয়্যতে বলা হয় যাতে করে যায়েদ ও বকরকে সত্যসত্যই একটা কিছু মনে হবে, তাহলে এটাও শিরক-এর মধ্যে গণ্য হবে।

তৃতীয় প্রকারের তৌহীদ হচ্ছে, খোদাতায়ালার সহিত প্রেমে উভয়ের মাঝখান থেকে নিজের ইচ্ছা অভিলাষকে বর্জন করা, এবং নিজের সত্তাকে তাঁর মাহাত্ম্যের মধ্যে নিমগ্ন করা। এই তৌহীদ তৌরিতের মধ্যে কোথায় আছে? এছাড়া তৌরিতের মধ্যে বেহেশ্ত এবং দোযখেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, এখানে সেখানে কিছু ইংগিত - ইশারা ছাড়া। একইভাবে, তৌরিতের মধ্যে খোদাতায়ালার কামেল বা পারফেক্ট গুণাবলীরও কোনও বিশদ বর্ণনা নেই। যদি তৌরিতের মধ্যে এমন কোন সূরা থাকতো যেমন কোরআন শরীফের মধ্যে আছে :

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ ﴿٢﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٣﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٤﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٥﴾

('তুমি বল, তিনিই আল্লাহ্ এক- অদ্বিতীয়; আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সবার নির্ভরস্থল। তিনি কাউকেই জন্ম দেননি এবং তাঁকে জন্ম দেওয়া হয় নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।')–১১২:২–৫।

তাহলে, খৃষ্টানরা, সম্ভবতঃ এক সৃষ্টিকে পূজা করা থেকে বিরত থাকতো। এছাড়া, তৌরিতের মধ্যে হকুক বা অধিকারসমূহের পরিমাণের কথাও পূরোপূরি বর্ণিত হয়নি। কিন্তু, কোরআন এই শিক্ষাকেও সম্পূর্ণতা দান করেছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বলা হয়েছে যে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى

['আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সুবিচার ও উপকার করার এবং আত্মীয়স্বজনকে (অনুরূপ নিয়্যতে অন্যদেরকেও) দান করার আদেশ দিচ্ছেন;] ১৬:৯১। অর্থাৎ, খোদা হুকুম দিচ্ছেন যে, তোমরা সুবিচার কর, এবং এর চাইতেও বেশী কর–তোমরা এহ্সান বা উপকার কর–; বরং এর চাইতেও বেশী কর; অর্থাৎ তোমরা মানুষের খেদমত এমনভাবে কর, যেমনভাবে কোন ব্যক্তি আবেগভরে তার আত্মীয়ের খেদমত করে। অন্য কথায়, মানব জাতির প্রতি তোমার সহানুভূতি হতে হবে স্বভাবজ, উপকারের ইচ্ছাপ্রসূত হলে চলবে না। তা হতে হবে ঠিক সন্তানের প্রতি মা-এর সহানুভূতির মত। একইভাবে তৌরিতের মধ্যে খোদার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব ও তাঁর কামেল বা সর্বোত্তম গুণাবলীকে যুক্তি-প্রমাণ

দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেখানো হয়নি। কিন্তু, কোরআন শরীফ এই সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাস, এবং তদুপরি ইলহাম বা ঐশীবাণী ও নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবং প্রত্যেকটি (বিষয়ের) বিতর্ককে দার্শনিকভাবে বর্ণনা করে সত্যান্বেষীর কাছে তা বুঝবার জন্য সহজ করে দিয়েছে। এবং এই সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ কোরআন শরীফের মধ্যে এমন উত্তমরূপে পাওয়া যায় যে, তা পেশ করা কারো ক্ষমতায় কুলায়ে উঠবে না। যেমন, খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ এমন কোন যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করতে পারবে না, যা কোরআন শরীফে নেই। 'এতদ্ব্যতীত, কোরআন শরীফের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে একটা বড় যুক্তি এই যে, পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাব-মূসার (আঃ) কিতাব তৌরিত থেকে নিয়ে ইঞ্জিল পর্যন্ত একটি বিশেষ জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য এসেছিল। এই কিতাবগুলিতে শুধু বনী ইসরাঈলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এবং পরিষ্কারভাবে দ্ব্যর্থহীন শব্দ প্রয়োগে বলা হয়েছে যে, এসবের মধ্যে বর্ণিত হেদায়াত সাধারণ ফায়দার অর্থাৎ সকল মানুষের উপকারের জন্য নয়। বরং এ শুধু বনী ইসরাঈলের জন্যই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে, কোরআন শরীফের উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা জগতের সংস্কার সাধন। এবং এর সম্বোধনের লক্ষ্য বিশেষ কোন জাতি নয়। বরং এতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, একে অবতীর্ণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য। এবং প্রত্যেকের সংশোধনই হচ্ছে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।'

(কিতাবুল বারিয়াহ্, পৃঃ ৮৩-৮৫)

(৪৮)

'পবিত্র কোরআন গভীর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। এবং প্রতিটি শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এবং প্রকৃত পুণ্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ ইঞ্জিল বা বাইবেলের তুলনায় অনেক দূর অগ্রবর্তী। বিশেষ করে, সত্য এবং অপরিবর্তনীয় খোদাকে দেখবার প্রদীপ তো কোরআনেরই হাতে। এই পবিত্র গ্রন্থ যদি দুনিয়াতে না আসতো তাহলে খোদাই জানেন দুনিয়াতে কত অসংখ্য সৃষ্টিকে পূজা করা হতো! অতএব, খোদার হাজার শোকর যে, খোদার যে একত্ব বা তৌহীদ দুনিয়া থেকে গুম হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' *(তোহ্ফা কায়সারিয়া, পৃঃ ৪৬)।*

(৪৯)

'কোরআন শরীফ জ্ঞান-প্রজ্ঞায় এমনভাবে ভরপুর যে, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক ঔষধের সমস্ত নীতি-নিয়মকে, অর্থাৎ ধর্মীয় নীতি-নিয়মকে যা কিনা আসলেই আধ্যাত্মিক ঔষধ, তার সঙ্গে দৈহিক ঔষধের সমস্ত নীতি-নিয়মেরও পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করেছে। এবং এই সামঞ্জস্য এত সূক্ষ্ম যে, তা শত শত মারেফত বা সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সত্যতাকে জানবার দুয়ার খুলে দিয়েছে। এবং সত্য ও পূর্ণ তফসীর কোরআন শরীফের কেবল সেই ব্যক্তিই করতে সক্ষম, যে দৈহিক ঔষধের নীতি-নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রেখেই কোরআন শরীফে বর্ণিত নীতি-নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। একবার আমাকে কাশ্ফে (দিব্যদৃষ্টিতে) কিছু বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসকের কিছু পুস্তক দেখানো হয়েছিল, যার মধ্যে দৈহিক ঔষধ-পত্রের নীতি-নিয়ম সম্পর্কিত আলোচনা ছিল। এ সবের মধ্যে সুদক্ষ চিকিৎসাবিদ করেশী-এর বইও ছিল। এবং এতে আমাকে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল যে, এই হচ্ছে কোরআনের তফসীর। এথেকে বুঝতে পেরেছিলাম যে, শরীর-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম-

বিজ্ঞানের এক গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, এবং এরা একে অপরের সত্যায়নকারী। এবং আমি যখন এই কেতাবগুলির অর্থাৎ এই দৈহিক ঔষধ পত্রের কিতাবগুলির উপর দৃষ্টি রেখে কোরআন শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে, দৈহিক ঔষধের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম নীতি-নিয়মের কথাও অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে কোরআন শরীফে।' *(চশমা মারেফত, পৃঃ ৯৪-৯৫)*

(৫০)

'কোন কিতাব যদি সৃষ্টির শুরুতেই নাযিল হতো, তাহলে তার সম্পর্কে যুক্তি-বুদ্ধির সিদ্ধান্ত এটাই হতো যে, তা কখনই পরিপূর্ণ বা কামেল কিতাব হতে পারতো না। বরং তা শুধু সেই শিক্ষকের মতই হতো যে বাচ্চাদেরকে বর্ণমালা শিক্ষা দেয়। স্পষ্টতঃই এরূপ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তেমন কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, যখন মানুষের অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল, এবং মানুষ ভ্রান্তির মধ্যেও পড়ে গেল, তখন বিস্তারিত শিক্ষাদানের প্রয়োজন দেখা দিল। বিশেষ করে যখন পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহীর অন্ধকার পৃথিবীকে ছেয়ে ফেললো এবং মানুষের আত্মা নানা প্রকারের ইলমী ও আমলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিক বিভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়লো, তখনই এক উন্নত এবং পরিপূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল, এবং সেটাই হচ্ছে কোরআন শরীফ। কিন্তু প্রাথমিক যুগের কিতাবে উন্নত স্তরের শিক্ষা থাকার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেননা, তখনও মানুষের আত্মা সিধা-সরল ছিল এবং অন্ধকার বা বিপথগামিতা তার মধ্যে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। হ্যাঁ, সেই কিতাবের মধ্যে উন্নত শিক্ষা থাকার প্রয়োজন ছিল, যা অতি গভীর অন্ধকারের সময় আর্বিভূত হয়েছিল। এবং সেই সমস্ত লোকের সংশোধনের নিমিত্তে আবির্ভূত হয়েছিল যাদের হৃদয়ের মধ্যে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসেছিল এবং জঘন্য ক্রিয়াকলাপ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।'

(চশমা মারেফত, পৃঃ ৬২, পাদটীকা)।

(৫১)

'এক্ষণে আমি আসল বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে লিখছি যে, একথা সত্য এবং সঠিক যে, সৃষ্টির শুরুতে মানুষ একটি ঐশী কিতাব পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, ঐ কেতাব বেদ ছিল না। বর্তমানের প্রচলিত বেদকে খোদাতায়ালার প্রতি আরোপ করা আর ঐ পবিত্র সত্তাকে অপমানিত করা একই কথা। এখানে কেউ যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, প্রথম যামানায় মাত্র একটি কেতাব কেন দেওয়া হয়েছিল মানুষকে? প্রত্যেকটি জাতির জন্য পৃথক পৃথক কেতাব কেন দেওয়া হয়নি? তাহলে এর জবাব হচ্ছে, প্রাথমিক যুগে মানুষ ছিল অল্প, তাদের সংখ্যা এতটাও ছিল না, যাতে করে তাদেরকে একটি জাতি বলা যায়। এজন্যেই তাদের জন্য একটি কেতাবই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর, মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়লো, এবং ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের বাশিন্দারা এক একটা জাতিতে পরিণত হলো, এবং বহু দূরে দূরে বসবাস করার দরুন যখন একে অপরের সঙ্গে একেবারে বিছিন্ন হয়ে পড়লো, তখন সেই যুগে খোদাতায়ালার প্রজ্ঞা বা হিকমত এটাই সমীচীন মনে করলো যে, প্রত্যেকটি জাতির জন্য পৃথক পৃথক রসূল এবং ইলহামী কিতাব দেওয়া হোক। সুতরাং সেটাই হয়েছিল। আবার যখন মানব জাতি পৃথিবীতে আরও বৃদ্ধি লাভ করলো এবং প্রসারিত হয়ে পড়লো এবং সাক্ষাৎ ও

যোগাযোগের রাস্তা খুলে গেল, এবং দেশের লোকের সঙ্গে আর এক দেশের লোকের দেখা সাক্ষাৎ করার উপায় উপকরণ সৃষ্টি হয়ে গেল, এবং এটাও জানা গেল ভু-পৃষ্ঠের অমুক অমুক অঞ্চলে মানুষের বসবাস আছে, তখন খোদাতায়ালা ইচ্ছা করলেন যে, সকল মানুষকে পুনরায় এক জাতিতে পরিণত করা হোক। এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে একত্রে জমা করা হোক। তখন, খোদাতায়ালা সকল দেশের জন্য একটি মাত্র কেতাবই পাঠালেন। এবং এই কেতাবের মাধ্যমে এই হুকুম দিলেন যে, এই কিতাব যে যে যামানায় বিভিন্ন দেশে পৌছে যাবে, সেই সকল দেশের জন্য এটা ফরয হবে যে, তারা একে কবুল করে নিবে, এবং এর উপরে ঈমান আনবে। এবং এই কেতাবই হচ্ছে কোরআন শরীফ যা অবতীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য। কোরআনের পূর্বে যে কেতাবগুলি নাযিল হয়েছিল সেগুলি এসেছিল বিশেষ বিশেষ জাতির জন্য। অর্থাৎ একটি কেতাব একটি মাত্র জাতির জন্যই এসেছিল। তাই, শামী, ফারেসী, হিন্দী, চীনী, মিসরী, রুমী প্রভৃতি যেসব জাতি ছিল, তাদের জন্য যে কিতাব বা যে রসূল এসেছিলেন তিনি শুধু তার জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন অপর জাতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক বা দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু, সকলের পরে এলো কোরআন শরীফ, যা একটি বিশ্বজনীন গ্রন্থ। এবং তা বিশেষ কোন জাতির জন্য নয়, বরং তা সকল জাতির জন্যই। একই সঙ্গে কোরআন শরীফ এক এমন **উম্মত**-এর জন্য এসেছে যা আস্তে আস্তে (সমস্ত জাতিসমূহকে) একই জাতিতে বা উম্মতে পরিণত করতে চায়। বর্তমানে এই যামানায় এমন সব উপায় উপকরণের সৃষ্টি হয়েছে যা বিভিন্ন জাতিসমূহকে ওহাদাত বা একত্বের রূপ দান করছে। পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ যা কিনা একজাতি বানানোর মূল শিকড়, তা এত সহজ হয়ে গেছে যে, কয়েক বছরের রাস্তা কয়েকদিনেই পাড়ি দেওয়া যায়। এবং যোগাযোগ বা তথ্যাদি আদান-প্রদানের এমন সব ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, দূর-দূরান্তের কোন দেশের খবরাদি যা এক বছরেও পাওয়া যেত না তা এখন এক মুহূর্তেই পাওয়া যায়। এ যুগে এমন এক বিরাট বিপ্লব ঘটে চলেছে এবং সংস্কৃতির স্রোতস্বীনির স্রোত এমনভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে, এটা স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠেছে যে, এখন খোদাতায়ালার ইচ্ছা এটাই যে, তিনি সমস্ত জাতিগুলিকে, যা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলিকে এক জাতিতে পরিণত করবেন। এবং হাজার হাজার বছর ধরে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাদেরকে একত্রিত করে দিবেন। এবং এই খরব কোরআন শরীফে দেওয়াই আছে। কোরআন শরীফ এই দাবী পরিষ্কারভাবে করেছে যে, তার আগমন ঘটেছে পৃথিবীর সমস্ত জাতিসমূহের জন্য। যেমন কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন : قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

('তুমি বল, হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের সকলের জন্য...') ৭:১৫৯।

অর্থাৎ, তুমি সমস্ত মানবমন্ডলীকে বলে দাও, আমি তোমাদের সকলের জন্যই রসূলরূপে আগমন করেছি। আবার বলেছেন : وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

('এবং আমরা তোমাকে সকল জাতিসমূহের জন্য কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।') ২১:১০৮।

আবারও বলেছেন : لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝

('যেন সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হয়')–২৫ঃ২।

আমরা এখানে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, কোরআন শরীফের পূর্বে পৃথিবীতে আর কোন ঐশী কিতাব এই দাবী করেনি। বরং প্রতিটি কেতাবই তার প্রেরিতত্বকে বা রেসালতকে সীমাবদ্ধ রেখেছে তার নিজ জাতির মধ্যেই। এমনকি, যে নবীকে খৃষ্টানরা খোদা বানিয়েছে তাঁর মুখ থেকেও এই কথাই উচ্চারিত হয়েছে যে, তাঁকে ইস্‌রাঈলের হারানো মেষ ছাড়া অন্য আর কারো জন্যই প্রেরণ করা হয়নি। এবং যামানার অবস্থাও এই সাক্ষ্যদান করছে যে, কোরআন শরীফের সার্বজনীন তবলীগের এই দাবী ছিল ঠিক সময়োপযোগী। কেননা, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সময়েই সার্বজনীন তবলীগের দরজা উন্মুক্ত হয়েছিল।' (চশমা মারেফত, পৃঃ ৬৬–৬৯)

(৫২)

'কোরআন শরীফে এই অঙ্গীকার ছিল যে, খোদাতায়ালা ফিৎনা ফাসাদ ও বিপদ আপদের সময় ইসলামের হেফাযত করবেন। যেমন বলা আছে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ۝

('নিশ্চয় আমরাই এক যিকর (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী') ১৫ঃ১০।

সুতরাং, এই অঙ্গীকার অনুযায়ী খোদাতায়ালা তাঁর কালামের হেফাযত করেছেন চার ভাবে :

(এক)–হাফেযগণের দ্বারা এর শব্দাবলী বা টেক্সট এবং এর অনুক্রম বা সিকুয়েন্স সংরক্ষিত রেখেছেন। এবং প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ পয়দা করছেন যাঁরা তাদের হৃদয়ে এই পবিত্র কালামকে সংরক্ষিত করে রাখছেন বা মুখস্থ করে রাখছেন। এমন মুখস্থ যে, যদি একটা কোন শব্দ জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তার আগের পিছের সবকিছু বলে দিতে পারেন। এবং এই উপায়ে প্রত্যেক যামানাতেই কোরআন শরীফকে শব্দগত প্রক্ষেপ বা তাহ্‌রীফ থেকে রক্ষা করেছেন।

(দুই)–ইমামগণের এবং বড় বড় ওলীদের মাধ্যমে, যাদেরকে প্রত্যেক শতাব্দীতেই কোরআনের গূঢ় জ্ঞান দান করা হয়েছে। যারা নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসের সাহায্যে যথোপযোগীরূপে কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা বা তফসীর করেছেন এবং খোদার এই পবিত্র কালামকে ও তাঁর পবিত্র শিক্ষাকে প্রত্যেক যুগেই অর্থের বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন।

(তিন)–মুতাকাল্লেমীন বা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে, যাঁরা কোরআনী শিক্ষাসমূহের যুক্তিসম্মত গ্রাহ্যতা দেখিয়ে দিয়ে খোদার পবিত্র কালামকে অদূরদর্শী দার্শনিকদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন।

(চার)–রূহানী এনআম (আধ্যাত্মিক পুরস্কার) প্রাপ্তগণের মাধ্যমে, যাঁরা খোদার পবিত্র কালামকে প্রত্যেক যামানাতেই মোজেযা (অলৌকিক নিদর্শন) ও মারেফত (নিগূঢ় অন্তর্জ্ঞান)-এর প্রতি অবিশ্বাসীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন।'

–(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৫৫)

'হতে পারে, এখানে কারো মনে এই কুধারণা বা ওসওয়াসা উঁকি দিতে পারে যে, মুসলমানদেরও এটাই ধর্মীয় বিশ্বাস বা আকিদা যে, ওহী বা ঐশীবাণী হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু হয়েছে এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কাজেই এই আকিদা অনুসারেও খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ)-এর পরে ওহী চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং,এর জবাবে মনে রাখা উচিত যে, হিন্দুদের মত আমাদের বিশ্বাস এটা নয় যে,খোদার কাছে ঠিক অতটাই বাণী বা কালাম ছিল যতটা তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। বরং, ইসলামী বিশ্বাস মতে, খোদার কালাম এবং খোদার জ্ঞান ও হিকমত তাঁর মতই অসীম। তাই, এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌তায়লা স্বয়ং বলেছেন :

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝

('তুমি বল, 'যদি সমুদ্র আমার প্রভু-প্রতিপালকের কালাম বা বাক্যসমূহের জন্য কালি হয়ে যায়, তবু আমার প্রভু-প্রতি পালকের বাক্যসমুহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমরা ওর সাহায্যার্থে সমপরিমাণ আরও সমুদ্র এনে দিই')।
-১৮:১১০।

অর্থাৎ, যদি খোদার কালাম লিখবার জন্য সমুদ্রকেও কালিতে রূপান্তরিত করা হয়, তবু লিখতে লিখতে সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ঐ কালাম-এর মধ্যে কোনও কমৃতি ঘটবে না। এমন কি, আরও অনুরূপ সমুদ্র যদি সাহায্যের জন্য আনা হয়, তবুও না। বাকী থাকলো এই কথা যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ওহী খতম হওয়াকে কী অর্থে মানি। তাই, (বলা দরকার যে,) এর আসল তাৎপর্য বা হকীকত হচ্ছে, যদিও ঐশী কালাম আপন সত্তায় অন্তহীন তবুও যেহেতু, যে সমস্ত ফাসাদ বা দুষ্কৃতি, যার সংশোধনের জন্য কালামে ইলাহী অবতীর্ণ হতো, এবং ঐ সমস্ত প্রয়োজনীয়তা যা পূরণ করে থাকে ঐশীবাণী বা কালামে ইলাহী, তা সবই সীমার অতিরিক্ত নয়। এ কারণেই, কালামে ইলাহীও সে পরিমাণেই অবতীর্ণ হয়েছে যে পরিমাণে তার প্রয়োজন ছিল বনী-আদমের বা মানব-সন্তানের জন্য। এবং কোরআন শরীফ এমন এক যামানায় এসেছিল যখন সম্ভাব্য প্রত্যেক প্রকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল অর্থাৎ, তখন চারিত্রিক এবং আদর্শিক এবং মৌখিক এবং ব্যবহারিক সমস্ত কিছুই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বিগড়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক প্রকারের বাড়াবাড়ি এবং প্রত্যেক প্রকারের দুষ্কৃতি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এজন্যই, কোরআন শরীফের শিক্ষাও চূড়ান্ত পর্যায়ে নাযিল হয়েছিল। অতএব, এই অর্থেই কোরআনী শরীয়ত সমাপ্ত এবং সম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী শরীয়তগুলো সব অসম্পূর্ণ। কেননা, পূর্ববর্তী যুগসমূহে, ঐ সমস্ত দুষ্কৃতি-যেগুলির সংশোধনের জন্য ঐশী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছিল সেগুলিও- তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়নি। কিন্তু, কোরআন শরীফের সময়ে ঐগুলি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই, কোরআন শরীফ এবং অন্য সব ঐশীগ্রন্থগুলির মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, পূর্ববর্তী কেতাবগুলি,সেগুলিকে যদি সব রকমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করাও হতো তবু, সেগুলির অসম্পূর্ণ শিক্ষার দরুন কোন এক সময়ে সম্পূর্ণ শিক্ষার

অর্থাৎ কোরআন মজীদ এর প্রকাশ ঘটার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, কোরআন শরীফের জন্য এখন আর এই প্রয়োজন নেই যে, এর পরে অন্য আর কোন কেতাব আসতে হবে। কেননা, পরিপূর্ণতার পরে আর কোন স্তর বাকী নেই। হ্যাঁ, যদি এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো যে, কোন সময়ে কোরআন শরীফের নীতিসমূহ বেদ ও বাইবেলের নীতিসমূহের মত বিকৃত ও শির্কযুক্ত হয়ে পড়বে, এবং তৌহীদের শিক্ষার মধ্যে পরিবর্তন ও প্রক্ষেপ সাধন করা হবে; এবং সেই সঙ্গে এই সম্ভাবনাও যদি থেকে যেত যে, কোন এক সময়ে কোটি কোটি মুসলমান- যারা তৌহীদের উপরে কায়েম রয়েছে তারা শির্ক ও সৃষ্টি পূজা অবলম্বন করবে, তাহলে সন্দেহ নেই, এই জাতীয় পরিস্থিতিতে আর একটি শরীয়ত এবং আর এক রসূলের আগমন অপরিহার্য হয়ে পড়তো। কিন্তু এই উভয় প্রকার সম্ভাবনাই বাস্তবে অসম্ভব। কোরআন শরীফের শিক্ষার প্রক্ষেপ ও পরিবর্তন সাধন এ জন্যই অসম্ভব যে, আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ۝

('নিশ্চয় আমরাই এই যিক্‌র (কোরআন) নাযিল করেছি, এবং নিশ্চয় আমরাই এর হেফাযতকারী।') -*১৫ঃ১০*।

তাই, বিগত তের শ' বছর যাবৎ এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে আসছে। আজও পর্যন্ত কোরআন শরীফের মধ্যে পূর্ববর্তী কেতাবগুলির মত কোন শিরক-যুক্ত শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারেনি। এবং ভবিষ্যতে এমনটা ঘটবার সম্ভাবনাও আদৌ বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়। কেননা, লক্ষ লক্ষ মুসলমান রয়েছে এর হাফেয। এর ভাষ্য বা তফসীরও রয়েছে হাজার হাজার। এর আয়াতসমূহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঠ করা হয়। প্রতিদিন এর তেলাওয়াত বা আবৃত্তি করা হয়। দুনিয়ার সব দেশে দেশে এর কোটি কোটি কপি প্রকাশিত হচ্ছে এবং পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকটি জাতি এর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। এবং এই বিষয়গুলি এমন যে, এগুলির ভিত্তিতে মানববুদ্ধি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আগামীতেও কোরআন শরীফের মধ্যে কোন প্রকারের পরিবর্তন বা বিকৃত্তি ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।' *((বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ১০০-১০২, হাশিয়া-৯)*

(৫৪)

'সপ্তম ওসওয়াসা (কুধারণা)ঃ কোন কেতাবের মধ্যেই ঐশী জ্ঞানের তামাম সাদাকাত বা সমস্ত সত্যতা শেষ হয়ে যেতে পারে না। কাজেই এটা কী করে আশা করা যায় যে, অসম্পূর্ণ কেতাব সম্পূর্ণ জ্ঞানে বা মারেফত-এ উন্নীত করতে পারবে?

উত্তর ঃ এই ওসওয়াসা (বা আপত্তি) তখনই প্রনিধানযোগ্য হতে পারতো যখন ব্রাহ্ম সমাজীদের মধ্য থেকে কোন ভদ্রলোক তাঁর যুক্তি-বুদ্ধির জোরে খোদাকে জানার সম্পর্কে কিংবা পরকাল-এর কোন বিষয় সম্পর্কে এমন কোন নতুন সাদাকাত বা সত্যতা পেশ করতে পারতেন, যা কোরআন শরীফের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এমন অবস্থায়, নিঃসন্দেহে, ব্রাহ্ম সাহেবরা বড়ই গর্বের সঙ্গে বলতে পারতেন যে, পরকাল এবং খোদাকে জানার যাবতীয় সত্যতা ঐশী কেতাবে বর্ণিত হয়নি। বরং, অমুক অমুক সত্যতার কোন উল্লেখই করা হয়নি, যেগুলির আবিষ্কার তারা করে ফেলেছেন। এমনটি যদি করে দেখাতেন, তাহলে হয়ত বা কোন মুর্খকে কিছু ধোঁকাও দিতে পারতেন। যা হোক, এক্ষেত্রে কোরআন শরীফের খোলাখুলি দাবী হচ্ছে :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

('আমরা এই কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দিইনি',...) ৬ঃ৩৯।

অর্থাৎ ঐশী জ্ঞান সম্পর্কিত কোন সত্যতা বা সাদাকাত যা কিনা মানুষের জন্য জরুরী, তা এই কেতাবের বাইরে নেই। আবারও বলা হয়েছে :

يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

('আবৃত্তি করে পবিত্র সহিফাসমূহ (কেতাবসমূহ) যার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে স্থায়ী আদেশাবলী।') ৯৮ঃ৩-৪।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল পবিত্র কেতাবসমূহ পাঠ করেন যার মধ্যে রয়েছে তামাম কামেল সাদাকাত এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিবরণ। এবং আবার বলা হয়েছে : كِتٰبٌ أُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝

('এ হচ্ছে এরূপ এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করা হয়েছে, অতঃপর সেগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে সবিস্তারে পরম প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ-এর তরফ থেকে।') ১১ঃ২।

অর্থাৎ, এই কিতাবের দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হচ্ছে, সর্বজ্ঞ খোদা একে সুদৃঢ়রূপে অর্থাৎ অত্যন্ত যুক্তিসম্মতভাবে জ্ঞানমণ্ডিত করে বর্ণনা করেছেন স্রেফ কথা ও কাহিনীর আকারে নয়। এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,-এর মধ্যে পরজগতের যাবতীয় বর্ণনা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। এবং বলা হয়েছে : إِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝

-('নিশ্চয় এ হচ্ছে (কোরআন) ফয়সালাকারী কালাম, এবং এ কোন অবান্তর কালাম নয়।')-৮৬ঃ১৪-১৫। অর্থাৎ পরজগৎ সম্পর্কে যে সমস্ত বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়, তার সবগুলির মীমাংসা করেছে এই কিতাব, এর কোন কথাই নিষ্ফল নয়, বৃথা নয়। আবারও বলা হয়েছে :

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

(এবং তোমার উপরে এই কিতাব এজন্যই নাযেল করেছি যেন তুমি (এর দ্বারা) তাদের নিকট তা পরিষ্কাররূপে বর্ণনা কর যার সম্পর্কে তারা পরস্পর মতভেদ করেছে এবং (আমরা একে নাযেল করেছি) হেদায়াত ও রহমতরূপে ঐ জাতির জন্য যারা ঈমান আনে।')- ১৬ঃ৬৫। অর্থাৎ আমরা এই কেতাব এই জন্য অবতীর্ণ করেছি যে, যাতে করে ঐ সমস্ত এখতেলাফ বা মতভেদ-যা সৃষ্টি হয়েছে ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি বা ফ্যালাসির কারণে কিংবা স্বেচ্ছাকৃত বাড়াবাড়ির কারণে তা সবই দূরীভূত হয়ে যায়; এবং ঈমানদারদের জন্য সোজা পথ বাত্‌লিয়ে দেওয়া যায়। এখানে এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে সমস্ত ফাসাদ বা বিশৃংখলা মানব সন্তানদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলোর সংশোধনও কালাম-এর উপরেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ সেই বিগড়ানো অবস্থা যার সৃষ্টি হয়েছে বেহুদা ও ভ্রান্ত কথা বা কালামের দ্বারা তাকে দুরস্ত করার জন্য এমন কালাম-এর প্রয়োজন যা সমস্ত প্রকারের ত্রুটি থেকে মুক্ত। কেননা, এতো পরিষ্কার জানা কথা যে, কথার দ্বারা যে বিপথগামী হয়েছে তাকে কথা দ্বারাই সৎ

পথে আনা সম্ভব। শুধু, প্রাকৃতিক নিয়মের ইঙ্গিত ইশারাই কথার মধ্যেকার পার্থক্যের মীমাংসা করতে পারে না; এবং পথভ্রষ্টকে তার পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী সম্পর্কেও পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে না। যেমন ধরুন, কোন হাকিম বা জজ সাহেব যদি বাদীর অভিযোগের বিষয় ও তার বক্তব্যকে বিস্তারিতভাবে রেকর্ড না করেন, এবং বিবাদীর আপত্তিসমূহকে অকাট্য যুক্তি দ্বারা খন্ডন না করেন, তাহলে এটা কী করে সম্ভব হবে যে, স্রেফ ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেই উভয় পক্ষ তাদের সব প্রশ্ন এবং আপত্তি এবং অজুহাত ইত্যাদির উত্তর পেয়ে যাবে? এবং কী করে এ ধরনের অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থক ইশারা-ইঙ্গিত যার উপরে কোন পক্ষই পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে না, তারই উপরে ভিত্তি করে চূড়ান্তভাবে রায় দান করা সম্ভব হবে? একইভাবে, খোদাতায়ালার যুক্তিদানও তখনই বান্দার উপরে সম্পূর্ণ হতে পারবে, যখন তাঁর তরফে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে, যে সমস্ত লোক ভ্রান্ত কথা-বার্তার প্রভাবে নানা প্রকারের কুবিশ্বাসের শিকারে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে তাঁর অভ্রান্ত ও সত্য কথা-বার্তার দ্বারা তাদের সব ভ্রম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। এবং যুক্তিপূর্ণভাবে সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে তাদেরকে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যদি বুঝার পরেও বা সতর্ক করার পরেও তারা বিরত না হয় এবং তাদের বিভ্রান্তি পরিত্যাগ না করে তাহলে তারা শাস্তিযোগ্য হবে। খোদাতায়ালা কোন ব্যক্তিকে অপরাধী বলে পাকড়াও করবেন এবং শাস্তিদানের জন্য প্রস্তুত হবেন অথচ, সুস্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা তার নির্দোষ হওয়ার প্রচেষ্টায় প্রদত্ত প্রমাণাদিকে ভুল প্রতিপন্ন করবেন না, এবং তার মনের সন্দেহকে নিজের প্রকাশ্য কালাম দ্বারা দূরীভূত করবেন না, এটা কি কোন সুবিচারের কথা হবে? তাই এরই দিকে ইশারা করে অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে : هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

('যা মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ, এবং হেদায়াত ও ফুরকানের (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার) জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ।')–২ঃ১৮৬

অর্থাৎ কোরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ রয়েছে : প্রথম, ধর্মীয় যে জ্ঞান মানুষ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সেই দিকে পরিচালিত করা। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে যে জ্ঞানের কথা সংক্ষিপ্তকারে বলা হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে বলা। তৃতীয়তঃ যে সকল বিষয়ে মতভেদ ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলির ব্যাপারে মীমাংসার কথা বলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেওয়া। এবং এই ব্যাপকত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا ۝

('এবং প্রত্যেক বিষয়কে আমরা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি) -1৭ঃ১৩ অর্থাৎ, এই কিতাবের মধ্যে ধর্মের প্রতিটি জ্ঞানকে সবিস্তারে খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে মানুষ কেবল আংশিক উন্নতিই লাভ করে না, বরং সে এর মধ্যে বর্ণিত উসিলা বা উপায় উপকরণ এবং এর মধ্যে প্রদত্ত সর্বোত্তম শিক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করে। পুনরায় বলা হয়েছে :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

('এবং আমরা আত্মসমর্পণকারীদের জন্য এই পূর্ণ কিতাব তোমার উপরে অবতীর্ণ করেছি সকল বিষয়ে ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং হেদায়াত ও রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ।')
–১৬ঃ৯০।

অর্থাৎ, এই কিতাব আমরা তোমরা উপরে এজন্যই নাযিল করেছি যাতে প্রত্যেকটি ধর্মীয় সত্যতা বা সাদাকাতকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়। এবং যাতে আমাদের সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ বর্ণনা ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য হেদায়াত ও রহমতের কারণ হয় যারা এতায়াতে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র আনুগত্য অবলম্বন করে। আবারও বলা হয়েছে :

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ ۙ

('আলিফ লাম রা; (এ হচ্ছে) কামিল (সর্বদিক থেকেই পরিপূর্ণ) কিতাব যা আমরা তোমার উপরে এই জন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে অন্ধকাররাশি থেকে বের করে আলোর দিকে আনতে পার') -১৪ ঃ ২।

অর্থাৎ, এই মহিমান্বিত গ্রন্থ আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে তুমি মানুষকে প্রত্যেক প্রকারের অন্ধকার থেকে বের করে এনে আলোর ভেতরে প্রবেশ করাতে পার। এবং এর মধ্যে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের মনের মধ্যে থেকে থেকে যত কুধারণা বা ওসওয়াসার উৎপত্তি হয়, যত সন্দেহ, সংশয়ের সৃষ্টি হয়, তা সবই দূরীভূত করে দেয় কোরআন শরীফ। এবং প্রত্যেক প্রকারের বাজে চিন্তাকে অপসারিত করে, পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে মানুষের মনকে। অর্থাৎ, খোদাতায়ালার দিকে রুজু করার বা প্রত্যাবর্তন করার এবং তাঁর প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যে জ্ঞান ও যে সত্যতার প্রয়োজন হয় তা সবই তাকে দান করা হয়। আবারও বলা হয়েছে : مَا كَانَ حَدِيۡثًا يُّفۡتَرٰى وَلٰـكِنۡ تَصۡدِيۡقَ الَّذِىۡ بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيۡلَ كُلِّ شَىۡءٍ وَّهُدًى وَّرَحۡمَةً لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ

('এ কখনও এমন কথা নয় যা স্বরচিত, বরং যা এর পূর্ব থেকে আছে এ তার সত্যায়নকারী এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ') ১২ঃ১১২

অর্থাৎ , কোরআন এমন কোন গ্রন্থ নয় যা মানুষ রচনা করতে পারে। বরং এর সত্যতার চিহ্নসমূহ সুপ্রকাশিত রয়েছে। কেননা, এ পূর্ববর্তী কেতাবগুলির সত্যায়ন করেছে। অর্থাৎ এর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণের কেতাবগুলিতে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সেগুলির সত্যতা এর অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। এবং যে সমস্ত ধর্মীয় সত্য বিশ্বাসের বা আকায়েদে হাক্কার ব্যাপারে ঐ সকল কেতাবে কোন যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া ছিল না সেগুলির পক্ষে কোরআন যুক্তি বা দলীল প্রমাণ পেশ করেছে। এবং সেগুলির শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। এইভাবে ঐ কেতাবগুলিকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে কোরআন, যার মাধ্যমে তার নিজের সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় নিদর্শন সত্যতার (কোরআন শরীফের) এই যে, এই গ্রন্থ ধর্মের প্রতিটি সত্যতার বর্ণনা দিয়েছে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াদির কথাও বলে দিয়েছে যা পূর্ণ হেদায়াত লাভের জন্য প্রয়োজনীয়। এবং এটাও তার জন্য সত্যতার নিদর্শন এই জন্য যে, এটা মানবীয় ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার যে, মানবীয় ক্ষমতা কখনই এতটা ব্যাপক হতে পারে না যার বাইরে আর কোনও ধর্মীয় সত্যতা এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান থাকতে পারে না।

সংক্ষেপে, এই সকল আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, কোরআন শরীফ সমস্ত সাদাকাত বা সত্যতার আধার। এবং এটার সত্যতার পক্ষে এক অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল। এবং এই দাবীর পর শত শত বৎসর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু

আজও অব্দি কোন ব্রাহ্ম বা অন্য কেউ এর মোকাবেলা করতে সাহস পায় নি। অতএব, এই অবস্থায় এটাই সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠেছে যে, এমন কোন নতুন সত্যতা পেশ না করে, যা কোরআন শরীফে নেই বলেই তারা মনে করে, অহেতুক পাগলদের বা ক্ষেপাদের মত উদ্ভট সব ধারণার কথা যার মধ্যে অন্তঃসার বলতে কিছুই নেই, তা পেশ করাটাই এই কথার শক্ত প্রমাণ যে, এই লোকগুলো সৎ লোকের ন্যায় সত্যের অনুসন্ধান করতে আদৌ আগ্রহী নয়। বরং তাদের নফসে আম্মারার বা অবাধ্য প্রবৃত্তির তাড়নার দরুন তারা এই চিন্তার মধ্যে পড়ে আছে যে, কীভাবে খোদার পবিত্র কালাম থেকে বরং খোদা থেকেই মুক্ত হওয়া যায়। এবং এই মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা খোদার সত্য কিতাব–যার সত্যতা সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত, তা থেকে মুখ ফিরায়ে রেখেছে। তারা না বিশেষজ্ঞদের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করতে রাজি, না শ্রোতার মনোভাব নিয়ে কারও কথা শুনতে রাজি। আচ্ছা! কেউ কি তাদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন যে, কে কখন কোন্ ধর্মীয় সত্যতাতে কোরআনের মোকাবেলায় পেশ করেছিল, যার কোন জবাব কোরআন দেয়নি? খালি হাতে ফিরায়ে দিয়েছে? কোরআন শরীফ তো তেরশ' বছর ধরে বুলন্দ আওয়াজে দাবী করে আসছে যে, সকল প্রকারের ধর্মীয় সাদাকাতে বা সত্যতায় সে ভরপুর। তাহলে, এটা কত বড় খবিসী বা ইতর স্বভাবের কথা যে, পরীক্ষা ছাড়াই এত মহান ও মহিমান্বিত গ্রন্থকেও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করা হবে! এবং এটাই বা কোন ধরনের ঔদ্ধত্য ও উন্নাসিকতা যে, না কোরআন শরীফের সত্যতাকে স্বীকার করবে, না তার দাবীকে খন্ডন করবে? সত্য তো এটাই যে, ঐ সমস্ত লোকের জিহ্বায় তো অবশ্যই কখনো কখনো খোদার নাম এসে যায়, কিন্তু তাদের হৃদয় পার্থিব নোংরামিতে ভরা। যদিও বা কেউ কোন ধর্মীয় আলোচনা শুরু করে দেয়, কিন্তু তা যথারীতি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চায় না। বরং তা অসম্পূর্ণ কথাবার্তার মধ্যে এমন সব ঘোঁট পাকিয়ে শেষ করে দেয় যে, পাছে না আবার কোন সত্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। পরে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে ঘরে বসে এই পরিপূর্ণ কেতাবকে নাকচ বা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রচার করতে থাকে, যা কিনা তার নিজের সমগ্রতার পক্ষে ঘোষণা করেছে : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

('আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন বা ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম..') -৫ ঃ ৪।

অর্থাৎ, আজ আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করার মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানকে পরিপূর্ণতার স্তরে উন্নীত করলাম এবং আমার সমস্ত নেয়ামতকে ঈমানদারদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম।

হে ভদ্র লোকেরা! কী, তোমাদের কি খোদার কোনই ভয় নেই? তোমরা কি এভাবেই চিরদিন বেঁচে থাকবে? একদিন কি খোদার সামনে তোমাদের ঝুটা মুখের উপরে অভিসম্পাৎ (লানত) পড়বে না? তোমাদের কাছে যদি কোন প্রকৃত সত্যতা থেকেই থাকে, যার সম্পর্কে তোমরা ধারণা কর যে, তা তোমরা চরম অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করে গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছ এবং তোমাদের মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়েই মনে কর যে, কোরআন শরীফ তার (সেই সত্যতার) বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে ; তাহলে তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি যে, সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে

সেই সত্যতা বা সাদাকাতকে আমাদের সামনে পেশ করা হোক, যাতে করে আমরা তা কোরআন শরীফ থেকে বের করে দেখিয়ে দিতে পারি।'

(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ. ২১৩-২১৭, পাদটীকা-১১)

কবিতা থেকে উদ্ধৃতি

(এক)

এসো হে খৃষ্টানগণ! এসো এই দিকে।
সত্যের আলো দেখো, সত্য পথ লাভ করো।
যত সৌন্দর্য সব তো কোরআনেই,
কোথায় ইঞ্জিলে তা থাকলে দেখাও।
মাথার উপরে স্রষ্টা, তাকে স্মরণ করো,
এভাবে সৃষ্টিকে আর ঠকিও না।
কতকাল আর মিথ্যার সঙ্গে প্রেম করবে,
সত্যের সঙ্গেও তো কিছু কাজ দেখাও।
কিছু তো ভয় করো খোদাকে, হে লোকসকল!
কিছু তো খোদারও প্রতি লজ্জাশীল হও।
দুনিয়ার ভোগ চিরন্তন নহে, হে বন্ধুরা!
এই দুনিয়াও চিরস্থায়ী নয়, হে বন্ধুরা!
এতো থাকবার জায়গা নয়, বন্ধুরা!
কেউ তো এখানে থাকেওনি বন্ধুরা!
ওহে প্রিয়গণ, শোন! কোরআন ব্যতীত
কখনই কোন মানুষ এই সত্যকে পায়নি।
যার কোন খবরই নেই এই আলোর,
তার এই বন্ধুর প্রতিও কোন দৃষ্টি নেই।
এই ফুরকানে আছে আশ্চর্য প্রভাব ও কার্যকারিতা,
যার সৃষ্টি করেছেন সেই প্রাণাধিক প্রিয় প্রেমিক্।
আমার কাছে শোন! এই মনোরম স্থানের কথা,
আমার কাছে শোন! সেই সুন্দর চেহারার বর্ণনা।
আঁখি যদি না-ই থাকে তো কানই যথেষ্ট,
তা-ও যথেষ্ট না হলে তো পরীক্ষাই যথেষ্ট!'

(দূর্রে সমীন)।

(দুই)

'কোরআনের রূপ মাধুরীকে জানে হৃদয়ের আলো মুসলমান,
আকাশের চাঁদ অন্য সবার আমাদের চাঁদ আল্ কোরান।
তুলনা তাহার নেইকো কোথাও দৃষ্টি ফেরায়ে দেখেছি ঢের,
কেমন করিয়া হবে না অতুল পবিত্র বাণী রহমানের!
চির-বসন্ত হাসিয়া ওঠে যে তাহার প্রতিটি স্বর থেকেই,
তার মত শোভা নেই তো বাগানে তার মত কোন বাগানও নেই!
নেইকো কোথাও তুলনা তো নেই আমার খোদার পাক কালামের,
হোক না মুক্তো আম্মানের সে হোক না সে মণি বদখ্শানের।
আল্লাহ্‌র বাণী মানবের কথা কী করে বলো তা সমান হবে,
হোথা কুদরত হেথা নিঃস্বতা ব্যবধান যেথা হামেশা রবে।
ফিরিশ্‌তা যার সমীপে সদাই করিছে স্বীকার অজ্ঞতার,
বাগ্মিতায় এ সীমিত মানুষ কী করে বা হবে সমান তার!

ছোট্ট কীটের একটি পা-ও তো বানাতে পারে না মানুষ কভু
তাহলে বল না, সত্যের আলো বানাবে কী করে মানুষ তবু!
ওহে মানুষেরা! গাও না কিছু তো! মহিমা মহান বারীতা'লার,
সংযত করো জবান, থাকলে ঈমানের কিছু ঘ্রাণ তোমার।
খোদার সমান অন্য কাউকে বানানো, কঠিন কুফর তার,
কিছুতো খোদাকে ভয় করো, প্রিয়! কর না ভীষণ মিথ্যাচার।
'আল্লাহ্ এক ও অংশীবিহীন' এই যদি হয় অঙ্গীকার,
তাহলে আবার হৃদয়ে কেন সে শির্‌কের এত অন্ধকার?
অজ্ঞতার এ পর্দা কী করে পড়লো তোমার দিলের 'পর,
পাপের ও পথ পরিহার করো থাকে যদি কিছু খোদার ডর।
আমার করার কী বা আছে ভাই! নসিহত করি বিনয় ভরে,
থাকে যদি কোন পবিত্র হৃদয় জান কোরবান তাহারই তরে।'

—(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ. ১৮৮)

(তিন)

'হৃদয়ে বাসনা কিতাবে তোমার সর্বদা চুমু দেই,
এই কোরআনের চারিদিকে ঘুরি কা'বা তো আমার এই-ই।'

(দূর্রে সমীন)।

(চার)

‘কোর্‌আনের আলো সব আলো থেকে উজ্জ্বল প্রকাশিল।
পবিত্র সেই যা থেকে আলোর এই নদী প্রকাশিল।।
তৌহীদের সে চারা ঝরে যেতো, কিন্তু অকস্মাৎ
অদৃশ্য থেকে আলোকের এই স্রোতধারা প্রকাশিল।
ইলাহী গো তব ফুরকান সেতো বিশাল জগৎ জানি,
জরুরী যা ছিল তা থেকে সবই তৈয়ার প্রকাশিল।
সারাটি জগৎ ঘুরেছি, দেখেছি বিপনী-বিতান সবই,
তত্ত্বজ্ঞান সে একটি মাত্র আয়নাতে প্রকাশিল।
কার সাথে এই আলোর তুলনা হবে এই পৃথিবীতে।
এর প্রতি কথা প্রতিটি বাণীযে অনুপম প্রকাশিল।

আগে ভেবেছিনু মূসার লাঠি বা হবে সেই ফুরকান,
পরে দেখি এর প্রতিটি শব্দ মসীহ্ রূপে প্রকাশিল।
অন্ধদের তো নিজেদেরই দোষ দেখে না তারা, এ আলো,
বিকীর্ণ যার রশ্মিতে শত সূর্যেরা প্রকাশিল।
জীবন তাদের ধূলোয় মিশেছে এই দুনিয়ার বুকে,
এ আলো থাকিতে হৃদয় যাদের অন্ধই প্রকাশিল।
জ্বলিবার আগে এসব লোকেরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে,
এদের প্রতিটি কথা থেকে শুধু মিথ্যাই প্রকাশিল।’
–(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ২৯৫, উপ–পাদটীকা–২)

(পাঁচ)

‘বন্ধুরা! যারা পাঠ করো এই উম্মে আল্ কিতাব,
আমার চক্ষু দিয়ে দেখো এবে আলোর সে আফতাব।
বার বার পড়ো ফাতিহার দোয়া এবং চিন্তা করো,
হকীকত সবই পাবে এতে তাই বার বার পাঠ করো।
খোদা তোমাদের শিখিয়েছে এই অনন্য প্রার্থনা,
হাবীবও তাঁহার শিখিয়ে দিলেন এযে সেই প্রার্থনা।
পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে পড়ো এই দোয়া মনে প্রাণে,
এই পথ ধরে যেতে পারো সেই প্রভুর সন্নিধানে।
কসম তাঁহারই যিনি এই দোয়া করেছেন অবতীর্ণ
পবিত্র সেই হৃদয়েতে যাঁর প্রিয়রূপ পরিকীর্ণ।

এ মোর প্রভুর তরফে সাক্ষী আমারই এ সত্তায়,
ইলাহী মোহর মেরেছে আমারই দাবীর সত্যতায়।
আমি যে মসীহ্ তারই তো সাক্ষী এই দোয়া অনুপম,
আমারই জন্যে এ যে সম্মানিত প্রভুর দলীল মম।
তবে কেন আর আমার পরে, এ অপেক্ষা তোমাদের,
অনুতাপ করো থাকে যদি কিছু আস্থা এ জীবনের।

(এজাযে মসীহ্)।

(ছয়)

'সেই প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা, মহিমা আর গৌবর যাঁর বর্ণনাতীত,
যাঁর কালাম থেকেই আমরা তাঁর নিদর্শন পেয়েছি।
সেই যে রৌশনী, যা আমরা লাভ করি এই কিতাবের মধ্যে,
তা হাজারো সূর্য থেকেও পাওয়া যাবে না কখনই,
তারই দ্বারা পবিত্র হয়েছে আমাদের হৃদয় ও বক্ষঃস্থল
সে নিজেই তার চেহারার আয়না হয়ে গেছে
হৃদয় বৃক্ষে সে মারেফত-এর ফল ফলিয়েছে
প্রত্যেক চিত্তের সন্দেহ সে ধৌত করেছে, হৃদয় বদলে দিয়েছে।
তারই মাধ্যমে খোদার চেহারা প্রকাশিত হয়েছে।
শয়তানের সব মক্কর ও ওসওয়াসা ব্যর্থ হয়ে গেছে।
সেই যে পথ যা গৌরব ও মহিমার প্রভুকে প্রদর্শন করে,
সেই যে পথ যা হৃদয়কে পাক ও পবিত্র করে তোলে,
সেই যে পথ যা হারানো বন্ধুকে ফিরিয়ে আনে
সেই যে পথ যা পবিত্র বিশ্বাসের মদিরা পান করায়
সেই যে পথ যা তারই হওয়ার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ
সেই যে পথ যা তাকে পাওয়ার লক্ষ্যে মহাসড়ক
প্রত্যেককেই সেই পথ সে দেখিয়ে দিয়েছে।
যত সন্দেহ আর সংশয় ছিল সব দূরীভূত করেছে,
বিষন্নতা যা ছিল প্রাণে অপসৃত হয়ে গেছে,
অন্ধকার সব হৃদয়ে যা ছিল তা আলো হয়ে গেছে।
শীতের যে বলয় ছিল তা বসন্তে বদলে গেছে
মৃদু সমীরণ বইতে লেগেছে, এ উঁপহার সেই প্রিয় সখার
শীতের রাত্রি পাল্টে গেছে তার আবির্ভাবে।
খোদার প্রেমের আগুন প্রতিটি হৃদয়ে জ্বলে উঠেছে,

বৃক্ষ যে সব বেঁচে ছিল পল্লবিত হয়েছে,
ফল এত যে ধরেছে সব ফলভারে নুয়ে পড়েছে।
তার তরঙ্গের আঘাতে কুধারণার পর্দা ফেটে গেছে।
অবিশ্বাস আর মিথ্যার পাহাড় খণ্ড-বিখন্ড হয়েছে।
কোরআন সেতো খোদাকে দেখার আয়না– খোদারই কালাম।
এ না হলে তো মারেফতের ফুলবাগান শূন্যই থেকে যেতো।
যারা সংশয়ের শৈত্যের প্রকোপে থর থর প্রাণ,
তারাও এই সূর্যের তলে অলৌকিক উত্তাপ পেয়ে থাকে।
দুনিয়াতে সব ধর্মের যত কলরব আর কলহ
সবই তো কথা ও কাহিনী কোথাও কোন আলো নেই।
কিন্তু, এই সে কালাম যা খোদার আলো দেখিয়ে দেয়
তার প্রতি সে আকর্ষণ করে নিদর্শনের জ্যোতির বিচ্ছুরণে।
সেই যে নিরাকার তার চেহারার দর্শন তো নিদর্শনের মধ্যেই
সত্য তো এটাই যে নিদর্শনই খোদায়ীর প্রমাণ।
দর্শন যদি না-ই মিলে তো কথা-ই যথেষ্ট,
বন্ধুর সৌন্দর্য আর রূপের প্রভা-ই যথেষ্ট।'

(সাত)

'এই ফুরকান শিখায়েছ তুমি ঃ ঈমানের সন্ধান,
এই ইরফান শিখায়েছ তাই দূর হলো শয়তান।
এ তোমার কৃপা অনুগ্রহরাজি এ তোমার এহ্‌সান,
তব তরে তাই এ প্রাণ আমার করিয়াছি কোরবান।
এদিন আমার মুবারক কর, প্রভু তুমি মহীয়ান!
পবিত্র তুমি দৃষ্টিতে তব আমার অবস্থান।
এই কোরআন রাহে ইরফান শিখায়েছে রহমান,
ইহাকে যে পড়ে তার 'পরে ঝরে খোদার অসীম দান।
তারই 'পরে জানি রয়েছে খোদার সীমাহীন কল্যাণ,
যে আনে ঈমান তারই, 'পরে ঝরে রহমত অফুরান।
এদিন আমার মুবারক কর, প্রভু তুমি মহীয়ান!
পবিত্র তুমি দৃষ্টিতে তব আমার অবস্থান।
সৎ পথের এ প্রস্রবণ যে পেয়েছে পুরস্কার–
এ খোদার কথা এরই মাধ্যমে বেলায়েত পায় তার।

এ আলো হৃদয়ে প্রবেশিয়া করে পবিত্র নির্মল,
চিত্ত সবার আলোকে আলোকে করে তোলে উজ্জ্বল।
এদিন আমার মুবারক করো, প্রভু তুমি মহীয়ান!
পবিত্র তুমি দৃষ্টিতে তব আমার অবস্থান।
কোরআনেরে মনে রাখিও বন্ধু পবিত্র আস্থা রেখো,
পর জগতের চিন্তা রাখিও, সন্তানে সাথে রেখো-
পরশ পাথর জানিও ইহাকে বন্ধু সুনিশ্চয়,
আন্তরিকতা রাখিও বন্ধু রাখিও মৃত্যু ভয়।
এদিন আমার মুবারক করো প্রভু তুমি মহীয়ান,
পবিত্র তুমি দৃষ্টিতে তব আমার অবস্থান।'